পথিক রাজপুত্র

শৈবাল চক্রবর্তী

পথিক রাজপুত্র

পথিক রাজপুত্র

শৈবাল চক্রবর্তী

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

পুচকন ও বাবাইকে

পথিক রাজপুত্র

এখন যেখানে দণ্ডকবন পুরাকালে সেখানে ছিল এক সুন্দর রাজ্য। সে রাজ্যের নাম সুন্দরগড়। সুন্দরগড় ছিল নন্দনকাননের মত সুন্দর। যেমন সুরম্য তার রাজপ্রাসাদ তেমনি ছবির মত সাজানো তার ঘরবাড়ি, পথঘাট, তেমনই চোখজুড়ানো নদী এবং গাছপালা। সুন্দরগড়ের রাজার নাম চন্দ্রকেতু, রাণীর নাম হৈমবতী। চন্দ্রকেতুর সুশাসনে প্রজারা সকলে খুশি। সুন্দরগড়ের শ্রী যে দেখে সে-ই মুগ্ধ হয়। প্রজারা গর্ব করে বলে, 'রাজা তো নন, উনি আমাদের পিতা আর রাণী যেন সাক্ষাৎ মা জননী।'

হৈমবতী প্রতি মঙ্গলবার সকালে প্রজাদের মঙ্গল কামনা করে বিষ্ণুদেবের মন্দিরে পূজো দেন, সন্ধ্যায় আরতি করেন মহালক্ষ্মীর দেউলে। পূজা-আরতির শেষে প্রজারা প্রসাদ নিয়ে যায় রাণীর হাত থেকে। রাজেশ্বরীর মত রাণী মহামন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে প্রসাদ বিলোন আর দলে দলে বালক, বৃদ্ধ, যুবা বিগ্রহকে প্রণাম করে ফল আর মিষ্টান্ন নিয়ে যায় তাঁর হাত থেকে। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে ঘরে ফিরে যেতে যেতে প্রজারা জয়ধ্বনি করে ওঠে, 'জয় মহারাজের জয়। জয় রাণী হৈমবতীর। জয় বিষ্ণুদেবের।'

সুন্দরগড়ের একদিকে ধূম্রপাহাড় অন্যদিকে সুজলা নদী। এই

নদীর জল যেমন স্বচ্ছ, তেমনি মিষ্টি তার স্বাদ। ধূম্রপাহাড়ের রং বর্ষার জলভরা মেঘের মত, তার উঁচু উঁচু চূড়োগুলো যেন আকাশ ছুঁতে চায়। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঘন জঙ্গল, যার নাম অন্ধবন। যেমন চাঁদে একটু কলঙ্ক লেগে থাকে, যেমন মানুষের জীবনে ছোট কোন দুঃখ তার সব আনন্দকে মিথ্যে করে দিতে চায় তেমনি সুন্দরগড়ের অপার সুখের মধ্যে অভিশাপ এই অন্ধবন। তার নিকষ কালো অন্ধকার দেখে অতি বড় সাহসীরও বুক ওঠে কেঁপে। তার ঘন ঝোপ ও বিশাল বিশাল মহীরুহ ভেদ করে ভেতরে পা দিতে পারে নি আজও পর্যন্ত কোন মানুষ। সূর্যের কিরণও সে অন্ধকারকে ভয় করে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে দূরে। রাজ্যের লোক বিশ্বাস করে একদিন এক পুণ্যবান এবং সাহসী পুরুষ এসে এই বনের পথ খুঁজে পাবেন। তখনই মানুষ সেই পথ ধরে যেতে পারবে ভেতরে। পাবে বসবাস করার নতুন ঠাঁই। অন্ধবনের মুক্তি ঘটবে সেইদিন। কিন্তু সে সাধক কবে আসবেন তা কেউ জানে না, সে সুদিন কতদূরে তা-ও কারু জানা নেই।

প্রাচীনেরা বলেন, এই বন বহুকাল ধরে এমনি এক অন্ধকারের দেশ হয়ে রয়েছে। দেশ-বিদেশে কত যোদ্ধা ও বীর যে এর পথ খুঁজতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে তা লেখাজোখা নেই। বীর পুরুষেরা অস্ত্রশিক্ষার আগে শপথ নেন তাঁরা এই বনের পথ খুঁজে বার করবেনই। প্রবীণেরা বলেন, অনেকদিন আগে এই অঞ্চলে মহাবল নামে ছিল এক ভীষণ দৈত্য। দিনের পর দিন অকারণে নিরীহ মানুষদের ওপর অত্যাচার করত সে। এমন এক সময় এল যখন সে মানুষকে হারিয়ে স্বর্গের দেবতাদের ওপর শুরু করল আস্ফালন। দেবতারা লক্ষ্য করছিলেন যে দিনে দিনে মহাবলের স্পর্দ্ধা সীমা ছাড়াতে চাইছে। তখন তাঁরা চাইলেন দৈত্যকে দমন করতে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হল দেবতা এবং দানবের মধ্যে। যুদ্ধের শেষে নিহত হল মহাবল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দণ্ডকবনের মানুষ। কিন্তু

তখন তারা জানত না যে তাদের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে আর এক দুর্ভাগ্য। দেবতাদের অস্ত্রে আহত মহাবল আর্তনাদ করতে করতে যেখানে পড়ে প্রাণ হারাল সেখানে তৈরী হল এক ভীষণ বন। যেন তার নিকষ কালো শরীর থেকে মাথা তুলে দাঁড়াল অন্ধকার আতঙ্ক এক। যেমন আগে মহাবলের ভয়ে লোকে সেই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করত না, এখন তেমনি সেই গহন বনকে ভয় পেতে লাগল লোকে একই রকম। জ্ঞানীরা বললেন, মহাবলকে হত্যা করা হয়েছিল হিংসে দিয়ে তাই এখানে এত অন্ধকার। তাঁরা আরও বললেন, একদিন এক পুণ্যবান মানুষ এখানে আসবে, মহাবলের হিংসের বিষকে সে দূর করবে তার ভালবাসা দিয়ে, সেদিন আবিষ্কার হবে এই বনের পথ; কাঁটার ঝোপে সেদিন ফুটবে সুগন্ধি ফুল, আলোয় আলোয় হেসে উঠবে গাছের পাতা। সেদিন হয়ত এই দুর্গম বন হয়ে উঠবে স্বর্গের উদ্যান। কিন্তু সে সুদিন যে কবে আসবে তা কারু জানা নেই।

* * *

চন্দ্রকেতুর দুটি ছেলেই দেবশিশুর মত সুন্দর। দুজনে এক মায়ের সন্তান তবু তাদের স্বভাবে মিল নেই কোন। বড় ভাই শুভেন কুমারের ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনোয় খুব মন। ব্রাহ্মণ, গুরু ও দেবতাদের ভক্তি করে সে খুব। অস্ত্রচালনায় পটু হয়েও নিরীহ পশু-পাখির ওপর কখনও সে বিদ্যে ফলায় না। রাজসভায় মহারাজের দক্ষিণ দিকে তার আসন। সে সহাস্য সুন্দর মুখে সেখানে বসে শোনে পণ্ডিতের শাস্ত্রপাঠ, রাজকবির লেখা কবিতা। শুনতে শুনতে উপনিষদের গল্প কি রামায়ণের ছন্দ নিয়ে এমন বুদ্ধিমানের মত প্রশ্ন করে যে পণ্ডিত ও কবি দুজনেই অবাক মানেন। এতটুকু বালক শাস্ত্র এবং কাব্যের ওপর এমন বিজ্ঞের মত প্রশ্ন করে কি করে! রাজপণ্ডিত মহারাজকে বলেন, 'বড় হলে কুমার হবে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত।'

মাথা নেড়ে রাজকবি বলেন, 'উঁহু ও হবে মহাকবি।' দুজনের মধ্যে এই নিয়ে বাধে তর্ক। রাজা চন্দ্রকেতুর আহ্লাদের সীমা থাকে না।

কাব্য আর শাস্ত্রের মত সঙ্গীতেও শুভেনের প্রতিভা দেখে তাঁর গুরু মুগ্ধ হন। কোন সুর একবার শুনলেই শুভেন তা তার গলায় বা বাঁশীতে অবিকল তুলে নিতে পারে। গানের গুরু আদর করে প্রিয় শিষ্যের নাম দিয়েছেন প্রভাতপাখি। তাকে উপহার দিয়েছেন তিনি তাঁর নিজের সুরেলাবাঁশী। গুরু মনে করেন রাজার ছেলে হয়ে জন্মেছে বলে শুভেন একদিন এ রাজ্যের রাজা হবে। কিন্তু কোন সাধারণ পরিবারে জন্মালেও একদিন গায়ক কি বাদক হিসেবে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ত দেশে দেশে।

ছোটকুমার শিখেন্দ্র কিন্তু সঙ্গীত কি শাস্ত্রের ধার দিয়ে যায় না। বই কি বীণার চেয়ে তার প্রিয় তরোয়াল কি তীর ধনুক। ছোটবেলা থেকে সে ভালবাসে রাজদণ্ড নিয়ে খেলা করতে। দাসদাসীদের হুকুম করতে শিখেছে সে মুখে বুলি ফোটার সঙ্গে সঙ্গে। আর একটু বড় হয়েই সে কল্পনা করত রাজা হওয়ার। একদিন সিংহাসন শূন্য পেয়ে বসেও গিয়েছিল তার ওপর। শিখেন্দ্রর স্বপ্ন, রাজা হয়ে সহস্র সৈন্য, রথ ও হাতির পাল নিয়ে প্রতিবেশী রাজ্য আক্রমণ করবে ও তা জয় করবে। যে অন্ধবন মানুষের আতঙ্ক ও ভয় সে খুঁজে বার করবে তার পথ। সে শিকারে যাবে সঙ্গে যাবে রাজহস্তী হিমালয়। তার তীরের আঘাতে লুটিয়ে পড়বে বন্য বরাহ ও সম্বর হরিণের দল। প্রজারা তাকে ভয় করবে, বিদেশী রাজারা পাঠাবে মূল্যবান উপহার। রাজা থেকে সে হয়ে দাঁড়াবে রাজাধিরাজ, সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট।

নদী বা পথ যেমন চলতে চলতে দুভাগে ভাগ হয়ে যায়, তেমনি দুই রাজকুমার যত বড় হয় তত যেন সরে যায় দুই দিকে। শিখেন্দ্র যখন মল্লযুদ্ধ শিখতে ব্যস্ত, শুভেন তখন মল্লার রাগে গান শেখে গুরুর

কাছে। শুভেন যখন সকালবেলায় মন দিয়ে রামায়ণ পড়ে, শিখেন্দ্র তখন শেখে তরোয়াল খেলা। সে বীরত্ব দেখিয়ে সবাইকে বশ করতে চায়। শুভেন ভালবেসে কাছে টানতে চায় আপন-পর সব মানুষকে। শিখেন্দ্র কটুভাষী, শুভেনের মুখ দিয়ে যেন মধু ঝরে। শুভেন ভালবাসে পুরাণের গল্প পড়তে, পুঁথি নিয়ে আলোচনা করতে। শিখেন্দ্রর একমাত্র স্বপ্ন রাজসিংহাসন। তখন আর খেলার ছলে নয়, পনেরো বছর বয়স হতে সে মনেপ্রাণে চায় রাজদণ্ড হাতে রাজসিংহাসনে বসতে। যদিও সে জানে এ সিংহাসনে বসার অধিকার বড়কুমারের, তার নয়।

এক বসন্তকালের সকাল। প্রাসাদের বাগানে গাছে গাছে গান গাইছে পাখির দল। শুভেন নিজের ঘরে বসে বীণা বাজাচ্ছে একমনে। শিখেন্দ্র সেখানে আসে। পরিহাস করে বলে, 'দাদা, তুমি যে রাজার ছেলে তা কে বলবে! তোমার স্বভাবে নেই এতটুকু গাম্ভীর্য। তুমি ধনী নির্ধন, ছোট-বড় সকলের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করো। তুমি কোন বাদক কি গায়কের ঘরে জন্ম নিলে পারতে।'

বীণার সুর পরখ করতে করতে শুভেন বলে, 'ভাই, মা-বাবার জন্যে গর্ব ও আনন্দে আমার বুক ভরে থাকে। তবে তোমায় সত্যি কথা বলি, রাজাদের মত কেবল যুদ্ধ করতে আর আয়েসে গা ঢেলে দিতে আমার ভাল লাগে না।' শিখেন্দ্রর হাতে ছিল তার প্রিয় তরোয়াল ঝিলিক। সে তা কোষ থেকে বার করতে জানলা দিয়ে আসা সূর্যের কিরণ তাতে লেগে ঠিকরে পড়ে চারিদিকে। তরোয়ালের ধার পরীক্ষা করতে করতে একটু বাঁকা হাসির সঙ্গে শিখেন্দ্র বলে, 'কিন্তু রাজত্ব চালাতে গেলে যুদ্ধ-বিগ্রহ তো করতেই হয় দাদা।'

বীণার তার বাঁধা হয়ে গিয়েছে শুভেনের, এবার তাতে একটি মিষ্টি ঝংকার তুলে সে বলে, 'ভাই, তোমাকে বলি! রাজত্ব চালানোর ইচ্ছে আমার এতটুকু নেই। কেবল রাজার ছেলে হয়ে জন্মেছি

সেই অধিকারে অন্যের ওপর প্রভুত্ব করে যাবো এতে আমার মন সায় দেয় না।'

শুভেন যখন তার ঘরে বসে তার ভাইকে এই কথা বলছে তখন প্রাসাদের আর এক ঘরে রাজা চন্দ্রকেতু ও রাণী হৈমবতী রাজ পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করছেন শুভেনের অভিষেকের দিনক্ষণ নিয়ে। চন্দ্রকেতু বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে এবার ছেলের হাতে রাজপাট সঁপে দিয়ে তিনি তীর্থে যাবেন। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন অভিষেক হয়েছিল তাঁর। চন্দ্রকেতুর সাধ যে সামনের ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন হোক শুভেনের অভিষেক।

বড়কুমারের কথা শুনে শিখেন্দ্র অবাক হয়। বড় বলে সিংহাসন পাওয়ার কথা শুভেনেরই। শিখেন্দ্র শুনেছিল দাদার অভিষেকেরও বেশী দেরী নেই। শুনে তার মনে জেগেছিল ঈর্ষা। সেদিন থেকে সে দাদার চলাফেরার ওপর নজর রাখত। দেখে শিখেন্দ্র সন্দেহ করত যে শুভেন বোধহয় মন্ত্রী ও অমাত্যদের সঙ্গে নিজের রাজা হওয়ার বিষয়ে গোপনে শলাপরামর্শ করে। একদিন কৌতূহলী হয়ে সে শুভেনের ঘরের জানালা ফাঁক করে দেখেছিল। না, ঘরে বড়কুমার একাই, আর কেউ নেই। অবাক হয়ে ছোটকুমার দেখে শুভেন চোখ বুজিয়ে বসে ধ্যান করছে। শিখেন্দ্র অবাক হয়। কিন্তু তার মন বলে এসব দাদার ছল। সে সিংহাসনেই বসতে চায়। তারই ফন্দি আঁটে ধ্যান করার ছল করে। দাদার গতিবিধির ওপর আরও কড়া নজর রাখতে হবে।

এ কাজে তার সহায় হল শিখেন্দ্রর বন্ধু বুদ্ধিধর। মন্ত্রীপুত্র বুদ্ধিধর শিখেন্দ্রর সমবয়সী ও প্রিয় বন্ধু। যেমন বামনের মত বেঁটে সে তেমনি কুমড়োর মত তার বপু। খুদে খুদে দুই চোখ আর থ্যাবড়া নাক মিলে বুদ্ধিধরের চেহারাকে করে তুলেছে কিম্ভূত। ভাঁড়ের মত দেখতে হলে কি হয় স্বভাবে বুদ্ধিধর ভারী চতুর। শিখেন্দ্রর নির্দেশ পেয়ে সে এখন দিবারাত্র নজর রাখে শুভেনকুমারের গতিবিধির ওপর।

শুভেন কিন্তু প্রতিদিনই এমনি ধ্যান করে। সে দেখেছে ধ্যানের সাহায্যে সে আরও ভালভাবে সঙ্গীত চর্চা বা শাস্ত্রপাঠে মন দিতে পারে। একদিন সেই ধ্যানের মাঝে সে শুনতে পায় কার কণ্ঠস্বর, 'তোমার কাজ শুধু রাজা হয়ে রাজ্য চালানো নয়। একটি বড় ব্রত আছে তোমার জীবনে। অন্ধবনের পথ খুঁজে বার করতে হবে তোমায়। এ কাজ করতে পারবে কেবল তুমি।'

দৈববাণী শুনে বড়কুমারের সারা দেহ ভয়ে, আনন্দে কেঁপে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে দেহে যেন নতুন শক্তি অনুভব করে সে। সেদিন থেকে সে অন্য মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। মনে মনে তৈরি হয় প্রাসাদ ছেড়ে পথে নামার জন্যে।

* * *

শিখেন্দ্র জানতে পারে তার দাদার অভিষেকের দিন স্থির হয়ে গেছে। রাজা অবশ্য এখনও তা শুভেনকে জানান নি। রাজ-জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করা বাকি আছে তাঁর। বড়কুমারের জন্মের সময় দেখে তিনি বিচার করে বলবেন দিনের কোন সময়টিতে অভিষেক করা শুভ হবে তার পক্ষে। এছাড়া আর সব আয়োজন সারা।

এ খবর পাওয়া মাত্র শিখেন্দ্র এসে উপস্থিত হয় শুভেনের কাছে। শুভেন তখন বাঁশীতে ভৈরবীর সুর সাধছিল। ভাইকে দেখে বাঁশী থামিয়ে ডাক দিয়ে বলে, 'এসো ভাই এসো।'

শিখেন্দ্র বলে, 'দাদা, কেমন আছো ?'

—ভাল আছি ভাই। তোমার সব কুশল তো ?

শিখেন্দ্র সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, 'দাদা শুনেছ, সামনের ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন তোমার অভিষেক ?'

শুভেন অবাক হয়ে বলে, 'না তো! এত তাড়াতাড়ি কেন ভাই ? আমি তো কিছু শুনি নি।'

শিখেন্দ্র বলে, 'বাবা যে তীর্থে যাবেন খুব শীগ'গির। তোমাকে রাজপাট সঁপে দিয়ে যাত্রা করবেন তিনি বিন্ধ্যাচল। হয়ত আজকালের মধ্যেই বাবা তোমাকে বলবেন একথা।'

শুভেনের মুখখানি ম্লান দেখায়। শিখেন্দ্র বলে, 'রাজা হওয়ার খবরে মনে হচ্ছে তুমি খুশি হওনি দাদা?'

ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শুভেন জবাব দেয়, 'আমি তো তোমায় আগেই বলেছি ভাই, রাজা হওয়ার ইচ্ছে আমার নেই। আমি খুব খুশি হব যদি বাবা আমাকে দেশভ্রমণে যাওয়ার অনুমতি দেন। পায়ে হেঁটে মা-বসুন্ধরাকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসার ভারী ইচ্ছে আমার। বিশাল এই পৃথিবীতে না জানি কত কি দেখার আছে।'

'পায়ে হেঁটে, অবাক হয়ে শিখেন্দ্র বলে, বলছ কি দাদা! এত হাতিঘোড়া তবে রয়েছে কি করতে? পায়ে হেঁটে যায় তো সাধারণ মানুষ। তুমি যে রাজপুত্র!'

শুভেন হাসে! তার হাসি তার বাঁশীর সুরের মতই মিষ্টি। বলে, 'ওভাবে ঘুরলে কিছু দেখা যায় না ভাই। পথের ধুলো পায়ে না লাগলে কারু ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয় না।'

হেসে শিখেন্দ্র বলে, 'এদিকে বলছ বিশাল পৃথিবী, তা পায়ে হেঁটে যদি যাও তবে কতটুকু ঘুরবে তুমি তার। পা যে তোমার ব্যথা হয়ে যাবে।'

শুভেনের মুখে মিষ্টি হাসিটি তখনও লেগে রয়েছে। সে বলে, 'ভাই চেষ্টায় কি না হয়! চলতে চলতে যদি ক্লান্ত বোধ করি তবে না হয় কোন পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেব বা কোন গাছের ছায়ায় বসে জিরিয়ে নেব খানিক। প্রকৃতি তো মায়ের মত, তাঁর কোল পাতা আছে সবখানে। তিনি নিশ্চয় সব ক্লান্তি দূর করে নতুন শক্তি যোগাবেন।'

কৌতুক করে শিখেন্দ্র বলে, 'আর বাঘ-ভাল্লুক? তারা তো

তোমার প্রজা নয়। তোমার বাঁশী শুনেও ভুলবে না তারা। এমন সুখাদ্য পেলে তারা কি ছেড়ে দেবে?'

শুভেন বলে, 'ভাই জীবজন্তু অকারণে মানুষকে আক্রমণ করে না। আমরাই বরং তাদের হত্যা করে আনন্দ পেতে চাই। তবে যদি কোন বিপদ ঘটে তবে জেনো আত্মরক্ষায় পিছপা হবো না নিশ্চয়!' শুভেনের দুই চোখ দীপ্ত হয়ে ওঠে, 'গুরুর কাছে মিথ্যে অস্ত্রশিক্ষা করিনি এতদিন।'

—আর দস্যু-তস্কর?

হেসে শুভেন জবাব দেয়, 'আমার কাছে কি-ই বা থাকবে যে তস্করের তাতে লোভ হবে!'

অবাক হয়ে শিখেন্দ্র বলে, 'সে কি, তুমি কি রাজকুমারের পোশাকে যাবে না? রত্নখচিত উষ্ণীষ, মুক্তাহার, গজদন্তের অঙ্গুরীয় ছাড়া কি রাজপুত্র পথে বের হয়?'

শান্ত গলায় শুভেন বলে, 'যে লোক পায়ে হেঁটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়েছে তার কি ওই পোশাক সাজে! আমি যে পথিক হতে চাই ভাই, রাজপুত্র নয়।'

শিখেন্দ্রর মুখে কথা সরে না। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বড়কুমারের মুখের দিকে। দাদার মাথার ঠিক আছে তো! সুন্দরগড়ের বড়কুমার কিনা পথে পথে ঘুরবে সাধারণ মানুষের পোশাকে!

শুভেনকুমারের সঙ্গে শিখেন্দ্রর যখন এই রকম কথা হচ্ছে তখন সে ঘরের দরজায় একজন আড়ি পেতে তাদের কথা শুনছে খুব মন দিয়ে। সে বুদ্ধিধর।

'জবর একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়', আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে নিজের মনে বলে বুদ্ধিধর, 'ছোট কুমারকে বলতে হবে এখনই। বড়কুমার হাওয়া হয়ে গেলে তাঁর রাজা হওয়া কে আটকায়। আর তিনি রাজা হওয়া মানেই আমার মহামন্ত্রী হওয়া। আর মন্ত্রী হওয়া

মানেই রাজসিংহাসনের কাছাকাছি চলে আসা।'

পা টিপে সেখান থেকে তখনই সরে পড়ে বুদ্ধিধর! খুদে খুদে চোখ দুটি আনন্দ ও উৎসাহে জ্বল জ্বল করছে তার তখন।

* * *

বড়কুমারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে শিখেন্দ্রর মনে হয় তার দাদা হয় পাগল হয়ে গিয়েছে নয় ছলনা করছে তার সঙ্গে।

শুভেন কিন্তু সত্যিই মনে মনে চঞ্চল হয়ে পড়েছিল দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ার জন্যে। কিন্তু এখনও যে বাবার অনুমতি নেওয়া হয়নি। শুভেন ঠিক করল কাল তার বাবা রাজদরবারে যাওয়ার আগেই সে তাঁকে গিয়ে বলবে সব কথা। ঠিক সেইদিনই চন্দ্রকেতু ঠিক করেছিলেন শুভেনকে তার অভিষেকের সুখবরটি দেবেন। কাল রাজজ্যোতিষী বড়কুমারের জন্মসময় বিচার করে বলেছেন যে অভিষেকের জন্যে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনটিই প্রশস্ত।

চন্দ্রকেতু যখন হৈমবতীকে এই সুখবরটি শোনাচ্ছিলেন ঠিক তখন শুভেন রাজমহলের দরজার কাছে এসে ডাকল, 'বাবা।'

—এসো বাবা, চন্দ্রকেতু এবং হৈমবতী দুজনে একসঙ্গে শুভেনকে আহ্বান করেন ভেতরে।

ঘরে ঢুকে বড়কুমার রাজা রাণী দুজনেরই পায়ের ধুলো নেয়, তারপর তার ইচ্ছের কথা জানায় তাঁদের। শুনে চন্দ্রকেতু ও হৈমবতীর মাথায় যেন বজ্রপাত হয়। ভগ্নকণ্ঠে চন্দ্রকেতু বলেন, 'বাবা, তুমি এ-কি বলছ! আমি স্বপ্ন দেখছি না তো!'

—না বাবা, এ সত্য। আমার দেশভ্রমণে যাওয়ার বড় সাধ। নম্রকণ্ঠে শুভেন বলে, আপনি আমায় অনুমতি দিন। আমি আমার স্বপ্ন সত্যি করে তুলি।

পিতামাতার কাছে এ বড় কঠিন আঘাত। আজ বাদে কাল রাজা হতে যাচ্ছে যে সে কি-না ভবঘুরের মত ঘুরবে পথে পথে। দুই

ছেলের মধ্যে শুভেন তাঁদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়। সে চোখের আড়াল হলে তাঁরা বাঁচবেন কি করে!

এ আঘাত চন্দ্রকেতুর কাছে এমনই নির্মম বলে বোধহয় যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারান। মায়ের চোখে নামে জলের ধারা। শুভেন তৎক্ষণাৎ পিতার সেবা করে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। মায়ের হাতটি ধরে বলে, 'মাগো, আমার একটি ব্রত আছে। আমায় অন্ধবনের পথ খুঁজে পেতে হবে। আমি ধ্যানের মধ্যে নির্দেশ পেয়েছি এই ব্রত পালন করার। তোমরা আমায় আশীর্বাদ করো আমি যেন এ কাজে সফল হয়ে ফিরে আসতে পারি।'

শুনে রাণীর বুক ভয়ে কেঁপে ওঠে। তাঁর মনে পড়ে যায় অনেকদিন আগের কথা। তখন শুভেনের জন্ম হয় নি। এক পুণ্যতেজা ঋষি এসেছিলেন প্রাসাদে। রাণীর হাতের রেখা দেখে বলেছিলেন, 'তোর খুব সুন্দর ছেলে হবে। তার নাম ছড়াবে দেশে দেশে। রূপে, গুণে সে হবে অতুলনীয়। শুনে হৈমবতীর আহ্লাদের সীমা ছিল না।'

হঠাৎ রাণীর হাতের আর এক রেখা দেখে ঋষির মুখ আঁধার হয়ে আসে। দেখে রাণী ব্যস্ত হন। বলেন, 'কি হল? অশুভ কিছু দেখলেন?' রেখা পরীক্ষা করে ঋষি বললেন, 'কিন্তু এই ছেলেকে বেশীদিন কাছে পাবি না তুই। যেদিন ডাক আসবে সেদিন চলে যাবে সে বনে।' ঋষি থামেন, তারপর পদ্মফুলের মত রাণীর সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোর আরও একটি ছেলে হবে। সে-ই হবে রাজা। বড়টির নাম ছড়াবে পৃথিবী জুড়ে, ছোটটি রাজত্ব করবে নিজের দেশে।' ঋষি হাসেন। রাণীর বুকের ভেতর কান্না যেন উত্তাল হয়ে ওঠে।

আজ বালক শুভেনের মুখের পানে তাকিয়ে হৈমবতীর সেই কথা মনে পড়ে যায়। ঋষির কথা যে এমন অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে এ তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। শুভেন ঠিক তখনই

বলে, 'মা তোমাদের তো আরও একটি ছেলে আছে। তাকে তোমরা রাজা করো। আমি তাতে সবচেয়ে খুশি হবো।'

রাণী বোঝেন এ শুভেনেরই উপযুক্ত কথা। এও জানেন যে শিখেন্দ্রর মধ্যে তার দাদার কোন গুণই নেই। সুন্দরগড়ের শাসন-ভার তার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সে ভোগবিলাস ভালবাসে, তার স্বভাবে মিষ্টত্ব নেই, তার মতিও স্থির নয়। রাজাকে দয়ালু হতে হয়। শিখেন্দ্র নিষ্ঠুর। তার ভবিষ্যৎ ভেবে রাজার চিন্তার শেষ নেই। শুভেন রাজা হলে চন্দ্রকেতু নিশ্চিন্তমনে তীর্থে যেতে পারতেন। বৃদ্ধ রাজা জানেন বড়কুমার রাজা হলে সুন্দরগড়ের শ্রী আরও বাড়ত, ধনদৌলত উপছে পড়ত। বড় সুখে দিন কাটাত প্রজারা। কিন্তু এ-কি হল! অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত হল কোন কারণে?

খবর ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। যে শোনে সে-ই হায় হায় করে। খুশি হয় একমাত্র ছোটকুমার শিখেন্দ্র। দাদা যদি প্রাসাদ ছেড়ে চলে যায় তবে তার রাজা হওয়া কে আটকায়। এখন কথা হচ্ছে, মহারাজ কবে তাকে অনুমতি দেবেন আর বড়কুমারই বা যাত্রা করবেন কোনদিন। দাদা মা-বাবাকে যেমন ভক্তি করে তাতে তাদের অনুমতি না পেলে সে এক পা নড়বে না। শিখেন্দ্র তার ঘরে বসে এইরকম চিন্তা করছে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে বুদ্ধিধর সেখানে আসে।

—খবর শুনেছ? ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করে সে শিখেন্দ্রকে।

—কি খবর? শিখেন্দ্র ভুরু কুঁচকে তাকায় বন্ধুর মুখের দিকে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপাগলায় বুদ্ধিধর বলে 'বড়কুমার রাজা হতে চান না।'

—শুনেছি।

—শুনেছ! আশ্চর্য তারপরেও তুমি হাত পা গুটিয়ে বসে আছো এখানে। তুমি না বলতে তোমার জীবনের একটিমাত্র উদ্দেশ্য সুন্দরগড়ের রাজা হওয়া?

—তা আমি বসে না থেকে খুব হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি করলেই কি সিংহাসনটা আমার হাতের মধ্যে এসে যাবে? বিরক্তির সঙ্গে বলে শিখেন্দ্র।

—তা কেন। শাস্ত্রে বলে যার বুদ্ধি আছে তার বল আছে। সংসারে কোন জিনিসই আপনা থেকে ধরা দেয় না, তাকে নিজের করে নিতে হয়।……হাত পা না ছোঁড়ো বুদ্ধি খাটাতে দোষ কি! নিজের বুদ্ধি কাজ না করলে আমার সাহায্য নাও। বুদ্ধিধর হাসে, 'দুনিয়ার যত বুদ্ধি সব ধরা আছে আমার মগজে', হাত দিয়ে নিজের বিরাট মাথাটি দেখায় বুদ্ধিধর।

—তা কোন বুদ্ধি খাটাতে বলছ তুমি আমায়? বাঁকা সুরে প্রশ্ন করে শিখেন্দ্রকুমার।

আবার এদিক ওদিক তাকায় বুদ্ধিধর। এটি তার মুদ্রাদোষ। তারপর চোখ পিট পিট করতে করতে বলে, 'শোনো, তোমার দাদাকে পরামর্শ দাও এখনই বেরিয়ে পড়তে। বলো, দেশভ্রমণের এই উপযুক্ত সময়। যত তাড়াতাড়ি কুমার বেরিয়ে পড়েন ততই মঙ্গল তোমার পক্ষে। যত দেরী হবে তত অনিশ্চয়তা বাড়বে।'

—ভাল বুদ্ধি দিয়েছ, আস্তে আস্তে বলে শিখেন্দ্র।

—বাবা আমার বুদ্ধিধর নাম দিয়েছিলেন কি সাধে? গর্বের সঙ্গে বলে বুদ্ধিধর, 'কিন্তু শোন, শুধু এতেই কাজ হবে না। যদি সিংহাসন থেকে দাদাকে সরিয়ে সেখানে বসতে চাও তবে মহারাজের মন থেকে বড়কুমারকে মুছে ফেলে সে জায়গা দখল করতে হবে তোমাকে। তুমি রাজাকে পরামর্শ দাও বড়কুমার যখন তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে দেশভ্রমণে যেতে চান তখন অবাধ্য পুত্রকে ধরে রাখার কোন অর্থ হয় না। রাজার উচিত যত শীঘ্র সম্ভব তাঁকে অনুমতি দেওয়া দেশভ্রমণে যাওয়ার। রাজার মনকে বড়কুমারের ওপর ক্রমে ক্রমে বিষিয়ে তুলতে হবে। কুমার একবার চোখের আড়াল হলে আর তোমাকে পায় কে! তখন তুমি অমাত্যবর্গকে হাত করতে পারবে

সহজে। আস্তে আস্তে রাজারও প্রিয় হয়ে উঠতে পারবে। সিংহাসন এসে যাবে তোমার হাতের মুঠোয়।

—সত্যি অদ্ভুত বুদ্ধি তোমার! শিখেন্দ্র তার আসন থেকে উঠে বন্ধুর হাতখানি ধরে বলে।

বুদ্ধিধরের কুতকুতে চোখ দুটি হাসিতে কুটিল হয়ে ওঠে, 'কিন্তু শোনো, এখানেই শেষ নয়। সিংহাসন পাওয়া এককথা আর তা বরাবরের জন্য নিজের করে রাখা আর এক কথা! একবার পথে বেরিয়ে পড়ার পর নিরস্ত্র বড়কুমারকে বন্দী করা হবে অতি সহজ কাজ। তারপর সিংহাসন ও রাজমুকুট দুই-ই হবে তোমার চিরকালের সঙ্গী।'

—সুন্দর। অপূর্ব! বুদ্ধিধরের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে ওঠে শিখেন্দ্র, 'তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছিনা ভাই। বুদ্ধিধর নাম সার্থক তোমার।'

গোঁফে তা দিয়ে মন্ত্রীপুত্র জবাব দেয়, 'কিন্তু শুধু তারিফ করলেই হবে না। পুরস্কারও দিতে হবে বন্ধু।' হাত পেতে দাঁড়ায় বুদ্ধিধর শিখেন্দ্রর সামনে।

—সেজন্য ভেবো না। শিখেন্দ্র তার হাতের ওপর নিজের হাত রাখে, 'আমি রাজা হওয়ার পর তুমি হবে আমার মহামন্ত্রী। সেই তোমার পুরস্কার। কেমন খুশি তো?'

সঙ্গে সঙ্গে দু-পা পেছিয়ে গিয়ে শিখেন্দ্রকে অভিবাদন করে বুদ্ধিধর। শিখেন্দ্র খুশি হয়।

মনে মনে বুদ্ধিধর বলে, 'শুধু মন্ত্রীগিরি পেলেই আমার মন উঠবে না বন্ধু। আমার আশা আর একটু বেশী।'

* * *

সে রাতটা বড় অশান্তির মধ্যে দিয়ে কাটে চন্দ্রকেতুর। হৈমবতী

তাঁর শিয়রের কাছে জেগে বসে থাকেন কতক্ষণ। দুজনেই ভাবেন শুভেনের কথা। তার জন্ম থেকে এত বড়টা হওয়া পর্যন্ত সব কথা মনে পড়ে রাজা-রাণীর। বরাবরই সে আদরের দুলাল তাঁদের। কোনদিন তার কোন কথায় না বলেন নি তাঁরা। শুভেনও অবাধ্য হয়নি একদিনও তাঁদের। তাকে কিছু দিতে পারলে প্রাণ ভরে যায় তাঁদের। কিন্তু আজ সে যা চাইছে তা দিতে যেন বুক ফেটে যাচ্ছে। এক তো সে রাজা হতে চায় না তার ওপর তার পণ সে অন্ধবনের পথ খুঁজে বার করবে। ওইটুকু এক বালককে তাঁরা কোন প্রাণে ছেড়ে দিতে পারেন এমন কঠিন কাজের জন্যে। ওই দুর্গম বনের কাছে গিয়ে কত রাজপুত্র প্রাণ হারিয়েছে, কত সাহসী যোদ্ধা আর ফিরে আসে নি, তা রাজা-রাণীর অজানা নয়। কোন প্রাণে তাঁরা শুভেনকে অনুমতি দেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে! অথচ শুভেনের তা নিয়ে এতটুকু চিন্তা নেই। সে যেমন হাসিমুখে মিষ্টান্ন চায় মায়ের কাছে তেমনি সরলতার সঙ্গে জানিয়েছে তার এই ইচ্ছের কথা।

এখন ভোর হয়েছে। প্রাসাদের তোরণ-গৃহে বাজছে সানাইয়ের সুর। বড়কুমার তার ঘরে বসে সানাইয়ে ভ্যাঁয়রোর সুরটি শুনছে আর তার বাঁশীতে তা বাজাচ্ছে অবিকল। তার মনও কিছু বিষণ্ণ। সে জানে মা-বাবা দুঃখ পেয়েছেন তার কথায়। সে রাজা হলে তাঁরা খুশি হতেন। অথচ তার রাজা হওয়ার ইচ্ছে নেই, উপায়ও নেই। তাকে খুঁজে বার করতে হবে অন্ধবনের পথ। এতে রাজ্যেরই মঙ্গল। ওই বন যেন সুন্দরগড়ের অভিশাপ। তাকে সে অভিশাপ জয় করতে হবে। হাজার হাজার মানুষের এতদিনের ভয় ঘোচানোর জন্য কুমারকে বিপদ মাথায় নিয়ে একাজ করতে হবে। তার জন্যে যদি প্রাণও বিসর্জন দিতে হয় তাতে কুমারের দুঃখ নেই।

বাঁশী বাজাতে বাজাতে আনমনে শুভেন এইসব কথা ভাবছে এমন

সময় শিখেন্দ্র এসে ঢোকে তার ঘরে।

—এসো ভাই, বাঁশী নামিয়ে ছোট ভাইকে আহ্বান করে শুভেন, আজ তুমি খুব সকালে বেরিয়ে পড়েছ দেখছি।

—তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম দাদা। শুভেনের কাছে বসে শিখেন্দ্র বলে, তুমি বলছিলে দেশভ্রমণে যাবে। তার জন্যে আমার মনে হয় এই বসন্তঋতুই উপযুক্ত সময়। এখন দিনে শীত কম, রাত্রে আকাশ পরিষ্কার। বৃষ্টি-বাদল নেই। আমার মনে হয়, যাত্রা করার পক্ষে এর চেয়ে সুন্দর সময় আর হতে পারে না।

খুশি হয়ে শুভেন বলে, 'তুমি ঠিক কথাই বলেছ ভাই। আমি ভাবছিলাম বাবার অনুমতি পেলে আগামী সপ্তাহেই যাত্রা করব আমি।'

শিখেন্দ্র তার আরও কাছে গিয়ে বলে, 'আগামী সপ্তাহে কেন দাদা! আমি রাজজ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলছিলেন কাল কি একটা সুন্দর যোগ রয়েছে। দেশভ্রমণের জন্যে এই তিথিটি বড় ভাল। তুমি যদি বলো তবে আমি তোমার যাত্রার আয়োজন করতে পারি।'

সস্নেহে ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে শুভেন বলে, 'ভাই, তুমি আমার জন্যে কত ভাবো! তোমার মত ভাই আমি কত ভাগ্যে পেয়েছি। তবে আমি যাবো একা তার আর আয়োজন কি! বাবার অনুমতি পাই নি বলে মনটা বড় চঞ্চল রয়েছে। তাঁর মত ছাড়া আমি যে এক পা এগোতে পারি না, এতো তুমি জানো।'

শিখেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'বাবার অনুমতির ভারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও দাদা। আমি কথা দিচ্ছি, বাবাকে আমি রাজী করাবো।'

শুভেন খুশি হল। ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'বেশ ভাই, তবে তাই হোক।'

ছল চাতুরীতে শিখেন্দ্রর জুড়ি নেই। শুভেনের ঘর থেকে বেরিয়ে

সে যায় মহারাজের কাছে। দুশ্চিন্তায় কাতর চন্দ্রকেতু একাই ছিলেন ঘরে। পিতার কুশল জিজ্ঞেস করে শিখেন্দ্র সবার আগে। তারপর তাঁকে জানায় যে শুভেন আগামীকালই যাত্রা করবে ঠিক করেছে। শুনে চন্দ্রকেতু বড় ব্যথা পান। শিখেন্দ্র তাঁর মুখের ভাব দেখে তা বুঝতে পেরে বলে, 'দাদা যখন তোমার অনুমতি বিনাই দেশভ্রমণে যাবে স্থির করেছে তখন তোমার যেচে আপত্তি করে কাজ কি। আমি যখন প্রাসাদে রয়েছি তখন স্বচ্ছন্দে তোমাদের ভার নিতে পারব। অবাধ্য সন্তানের জন্যে বিলাপ করা বৃথা।'

শুনে বৃদ্ধ চন্দ্রকেতুর চোখ ছলছল করে ওঠে। শুভেন তাঁর অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করল না জেনে বড় অভিমান হয় তাঁর। জননী হৈমবতী একথা শুনে 'হা শুভেন' বলে শিরে করাঘাত করে কেঁদে ওঠেন।

পিতামাতাকে সেই অবস্থায় রেখে আবার শুভেনের কাছে ফিরে আসে শিখেন্দ্র। শুভেন তার পথ চেয়ে বসেছিল। ছোটকুমার বলে, 'অনেক বলে কয়ে বাবার অনুমতি নিয়ে এলাম দাদা। তোমার দেশভ্রমণে যাওয়ায় আপত্তি নেই তাঁর। যাওয়ার সময় একটু বলে গেলেই চলবে তাঁকে।'

শুনে ছোট ভাইকে আলিঙ্গন করে শুভেন বলে, 'আমার একটা কঠিন কাজ তুমি বড় সহজে করে দিলে ভাই। তোমার উপকার আমি জীবনে ভুলব না।'

দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেও চন্দ্রকেতু কখনই আশা করেন নি যে শুভেন সত্যি সত্যি চলে যাবে এবং তাঁর বিনা অনুমতিতেই। তাই পরদিন শুভেন যখন যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় তখন তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেন না। এত আদরের ছেলে যে তার এই মতি! এমন গভীর আদর্শবোধ যার তার এই পিতৃভক্তির নমুনা! তবে তো শিখেন্দ্র মিথ্যে বলে নি। দেশভ্রমণই তাহলে বড় শুভেনের কাছে। পিতামাতার সাধ

আহ্লাদের কোন দামই নেই ? রাজা গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন।

শুভেন আসে শিখেন্দ্র চলে যাওয়ার কিছু পরে। মৃদু নম্রস্বরে সে যখন বলে, 'বাবা, আমার যাত্রার সময় হয়েছে আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন।' তখন চন্দ্রকেতুর মনে হল কে যেন তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল। গলা রুদ্ধ হয়ে এল তাঁর অভিমানে। চোখের জল লুকানোর জন্যে ফিরিয়ে নিলেন মুখ। শুভেন যখন তাঁর পায়ের ধূলো নিল নিচু হয়ে তখন তার মাথায় হাত রাখতেও ভুলে গেলেন রাজা। রাজকুমারের সন্ন্যাসীর বেশ দেখতে পারবেন না বলে জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন ধূম্রপাহাড়ের দিকে।

দেখে শুভেনের বড় কষ্ট হল। ঘর থেকে বেরিয়ে ছল ছল চোখে সে শিখেন্দ্রকে বলল, 'ভাই, বাবা আমার সঙ্গে একটা কথাও বললেন না। বাবা কি আমার ওপর রাগ করেছেন কোন কারণে ? বল ভাই, আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে।'

শিখেন্দ্র জবাব দিল, 'ও নিয়ে তুমি কিছু ভেবো না দাদা। তুমি চলে যাচ্ছো বলে বাবা দুঃখ পেয়েছেন, তাই চুপ করেছিলেন। আমার তো মনে হয় বাবা মনে মনে খুশিই হয়েছেন তুমি এমন একটা কঠিন কাজ করতে যাচ্ছো বলে। অন্ধবনে যাওয়া কি সোজা কাজ! বাবা বোধহয় সে জন্যেও চিন্তিত কিছুটা।'

বুদ্ধিধর সেখানে ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'তাছাড়া সামনের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ছোট রাজকুমারের অভিষেক। তা নিয়েও মহারাজের ভাবনা বড় কম নয়।'

খুশি হয়ে শুভেন বলে, 'বেশ ভাই, তুমি রাজা হচ্ছো জেনে আমি বড় খুশি হলাম।' ভাইয়ের দুটি হাত নিজের হাতে ধরে সে বলে, 'আমি প্রার্থনা করি, তোমার অভিষেক নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক। তোমার সুশাসনে মঙ্গল হোক প্রজাদের। পিতা, মাতা, গুরু, ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ সূর্যালোকের মত ঝরে পড়ুক তোমার মাথার ওপর।'

বুদ্ধিধর মনে মনে বলে, 'আগে তো তুমি বিদায় হও। তারপর প্রজাদের মঙ্গল, সূর্য্যালোক, ইত্যাদি।'

শিখেন্দ্র কিন্তু অবাক হয়ে যায় দাদার কথাগুলো শুনে। যে শুধু 'হ্যাঁ' বললেই পেতে পারত এই সিংহাসন, এই রাজপাট সে আজ সব ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় এত সরল মনে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেল তাকে! দাদা কি সত্যিই এত মহৎ! শিখেন্দ্রর কি মনে হল সে হেঁট হয়ে শুভেনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। শুভেনও সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় হাত দিয়ে উচ্চারণ করল, 'সুখী হও।'

তবু মনে মনে শিখেন্দ্র অধৈর্য হয়ে উঠেছিল কতক্ষণে বড়কুমার প্রাসাদের বাইরে যাবে। সে খবর পেয়েছিল যে শুভেন চলে যাবে শুনে প্রজা এবং অমাত্যরা খুব দুঃখ পেয়েছে। শিখেন্দ্র রাজা হলে প্রজারা বিদ্রোহ করবে এমন খবরও তাকে এনে দিয়েছিল গুপ্তচর। তাই যতক্ষণ না বড়কুমার প্রাসাদের বাইরে চলে যাচ্ছিল ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না সে।

রাজার কাছে বিদায় নেওয়ার পর শুভেন গেল রাণীর মহলে। সে যখন বালক সন্ন্যাসীর বেশে হৈমবতীর ঘরের দুয়ারে গিয়ে 'মা' বলে ডাক দিল তখন তার সে বেশ দেখে দাসীদের চোখে জল এল। তার মাথার চুল চূড়ো করে বাঁধা, পরনে গেরুয়া বসন, পা দুটি খালি। তার হাতে রয়েছে মোহনবাঁশী। শুভেন ভেবেছিল বাবার মত মা-ও বোধহয় মুখ ফিরিয়ে থাকবেন। তাই কিছুটা দ্বিধা নিয়েই সে ডেকেছিল 'মা' বলে। কিন্তু সে ডাক কানে যাওয়া মাত্র ব্যাকুল হৈমবতী ঘরের বাইরে এসে হেঁট হয়ে শুভেনকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর বুকে। মা জানেন ঋষিবাক্য মিথ্যে হবার নয় আর এ-ও জানেন চোখের জল ফেলে ছেলেকে বিদায় দিলে তার অকল্যাণ হবে। তাই তিনি তাকে আদর করে হাসিমুখে বললেন, 'এসো বাবা, ভগবান যেন সর্ব বিপদ থেকে তোমাকে রক্ষা করেন। আশীর্বাদ করি তোমার কাজে তুমি সফল হও। গাছ যেন তোমায় ছায়া দেয়,

প্রাণীরা তোমায় পথ বলে দেয়, নদীর শীতল জল তোমার তেষ্টা মেটাতে মধুময় হয়ে ওঠে। আমি পথ চেয়ে বসে থাকব, ব্রত পালন শেষ করে যেদিন তুমি আবার এসে দাঁড়াবে আমার দুয়ারে সেদিন আমি দুঃখীকে অন্ন, ব্রাহ্মণকে বস্ত্র দান করে পূজা দেব বিষ্ণুদেবের। তোমার জয় হোক পুত্র।'

শুভেনের মন ভরে যায়। বাবার কাছে যে দুঃখ সে পেয়েছিল মার মিষ্টি কথায় তার সব সে ভুলে গেল। হেঁট হয়ে মাকে প্রণাম করে যখন বাইরে এসে দাঁড়াল সে তখন তার মনে হল তার মত সুখী সংসারে আর কেউ নেই।

রাজপ্রাসাদের ও পথের দু-পাশের বাড়ির জানালায় তখন পুরবাসীদের ভীড়। হাজার হাজার মানুষ পথের দু-ধারে ছল ছল চোখে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের প্রিয় রাজকুমারকে বিদায় জানানোর জন্যে। রাজপুত্র চলে যাচ্ছেন, সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন যেন তাদের সমস্ত আনন্দ। পথে পথে আজ নারী-পুরুষ ধনী-দরিদ্রের ভীড়। শুধু মানুষ নয়, পশু পাখি, বৃক্ষ লতা সকলেই যেন আজ দুঃখে কাতর। সকল সময় হাসি-খুশি থাকে যে শিশুটি তার মুখখানিও এখন মলিন। ময়ূর তার নাচ থামিয়েছে, দোয়েল ভুলেছে তার গান, করবী কুন্দের ফুল গেছে অকালে ঝরে। যাদের কাজই লোক হাসানো সেই বিদূষকের দল রঙ্গ ভুলে এখন দাঁড়িয়ে আছে শোকে দুঃখে পাথর হয়ে।

যতক্ষণ বড়কুমার সামনে ছিলেন হৈমবতী অনেক চেষ্টায় মুখে হাসি টেনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার সামনে। এখন কুমার চোখের আড়াল হতেই তিনি বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে দাসীদের বললেন, 'বল দাসী বল, কুমার কোন পথে কীভাবে যাচ্ছে। আমার বাছার মুখখানি কেমন দেখাচ্ছে, বল তোরা শুনি।'

দাসীরা দেখছিল প্রাসাদের চত্বর পেরিয়ে বড়কুমার চলেছেন। তাঁর পেছন পেছন চলেছে রাজ্যের যত লোক। অসংখ্য মানুষের ভীড়ের মধ্যে কুমারের মুখখানি জ্বলজ্বল্ করছিল তাদের চোখের সামনে।

কুমার হাসিমুখে হাত নেড়ে বিদায় নিচ্ছে সবার কাছ থেকে। সবার মুখ ম্লান শুধু তাঁরই মুখে অনাবিল হাসি। দাসীরা রাণীকে শোনাচ্ছিল সেই সব কথা। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে রাণী শুনছিলেন তাঁর আদরের দুলাল, নয়নের মণি আজ প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কবে ফিরে আসবে তা কেউ জানে না।

শুভেন যত এগিয়ে যেতে থাকে রাজ্যের সব মানুষ, পশুপাখি নীরবে চলতে থাকে তার পিছু-পিছু। শুধু গাছপালার চলার শক্তি নেই বলে তারা তাদের ডালপালা নেড়ে বিদায় জানায় তাদের প্রিয় রাজপুত্রকে।

রাজ্যের দক্ষিণ দিকের সীমানা সুজলা নদীর তীর পর্যন্ত এসে থামল সেই শোভাযাত্রা। কুমার হাত তুলে বলল, 'এবার আমায় বিদায় দাও ভাই। ফিরে গিয়ে যে যার কাজে মন দাও। দেবতা, রাজা আর গুরুজনদের ভক্তি কোরো এই আমার অনুরোধ।'

সকলে শান্ত হয়ে শোনে সেই কথা। ঝাপ্‌সা হয়ে এল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার চোখ। কুমার নদী পেরিয়ে ওপারে গেলেন। ধূম্র পাহাড়ের আড়ালে সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। মাঝি শূন্য নৌকা নিয়ে ফিরে এল এপারে। পাখিরা বাতাসে হাহাকার তুলে ফিরে গেল তাদের বাসার দিকে। প্রজারা বিলাপ করতে করতে ফিরল যার যার ঘরে।

* * *

এখন আর শিখেন্দ্রকে পায় কে! এত সহজে যে কাজ হাসিল হবে তা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। সিংহাসনের জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠল সে সেইদিন থেকে। এখন সে সর্বক্ষণ মহারাজের কাছাকাছি থাকে, তাঁকে খুশি করার চেষ্টা করে। যাতে তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর অভিষেকের হুকুম দেন। এবার সে রাজা হবে, মহামন্ত্রী হবে প্রিয়-বন্ধু বুদ্ধিধর। গর্বে শিখেন্দ্রর মাটিতে পা পড়ে না যেন।

মহারাজ চন্দ্রকেতুর তীর্থযাত্রার দিন এগিয়ে আসে। শুভেন যেন তাঁর বুকটা খালি করে চলে গেছে। এখন রাজসভায় গিয়ে বসতেও মন চায় না তাঁর। অথচ রাজকার্য না করলেই নয়। প্রজার শাসনের ভার রাজার উপর। রাজা প্রজার পালক শুধু নন পিতার সমান। তাই রাজসিংহাসন শূন্য রাখার কথা ভাবা যায় না। চন্দ্রকেতুর মন তাই চিন্তা ও ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

অমাত্যরা রাজাকে অবসর না নেওয়ার জন্যে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু চন্দ্রকেতু তীর্থে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করলেন না। শুভেন চলে যাওয়ার পর রাজপ্রাসাদ তাঁর কাছে শূন্য, শ্রীহীন বলে মনে হচ্ছিল। এদিকেশিখেন্দ্র তার অভিষেকের জন্যে পীড়াপীড়ি করে চলেছে। অবশেষে চন্দ্রকেতু একদিন আদেশ দিলেন যে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন শুভেনের অভিষেক হওয়ার কথা সেইদিনই অভিষেক হবে শিখেন্দ্রকুমারের। সুন্দরগড়ের রাজা হবে শিখেন্দ্র।

অভিষেক হল। নতুন রাজা সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বাজল, সানাইয়ে পোঁ ধরল। প্রজারা দিল করতালি। তবু সে উৎসবে যেন প্রাণ নেই। নাচ, গান, আনন্দের মাঝে মত্ত থেকেও প্রজাদের মনে পড়ছিল শুভেনের কথা। আজ যদি ছোটকুমারের জায়গায় তার অভিষেক হত তবে নিশ্চয় রাজ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যেত। নতুন রাজার নামে জয়ধ্বনি দিতে গিয়ে অনেকের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। কেউ কেউ মুখ লুকিয়ে চোখের জল ফেলল সেই রাজপুত্রের জন্যে পথই যার সঙ্গী এখন।

শিখেন্দ্র এখন রাজা। তার অনেকদিনের ইচ্ছে আজ পূর্ণ হয়েছে। তবু সে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত নয়। শিখেন্দ্র দেখল যে সে রাজা হয়েছে বটে কিন্তু সেনাপতি থেকে দরবারের দ্বারী পর্যন্ত কেউ তাতে খুশি নয়। সবাই কলের পুতুলের মত নমস্কার করে তাকে কিন্তু তাদের মুখ দেখে শিখেন্দ্র বুঝতে পারে যে তাদের মনে ভক্তি নেই। শিখেন্দ্র বিরক্ত বোধ করে। সে বুঝতে পারে যে এরা

আসলে ভালবাসে বড়কুমারকে। চায় সে-ই রাজা হোক। রাগের সঙ্গে সঙ্গে শিখেন্দ্রর মনে একটা ভয়ও দেখা দেয়। যদি কোনদিন বড়কুমার ফিরে আসে তবে রাজ্যের অসংখ্য প্রজা তাকেই রাজা করতে চাইবে। তখন তার কি উপায় হবে। তাই সে দেশে দেশে চর পাঠিয়ে দেয় বড়কুমারের খবর এনে তাকে জানাতে। হুকুম দেয়, দরকার হলে যেন তাকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয় তার সামনে।

এই ভীষণ খবর চন্দ্রকেতুর কানে এসে পৌঁছয়। শুভেন চলে যাওয়াতে তিনি শয্যা নিয়েছিলেন, এখন এ-খবর শোনামাত্র তিনি 'হা শুভেন, হা শুভেন' করে প্রাণত্যাগ করেন। সুন্দরগড়ের ঘরে ঘরে পড়ে যায় কান্নার রোল। প্রজারা বিলাপ করে বলে আজ আমরা পিতৃহারা হলাম।'

চন্দ্রকেতু মারা গেলেন, শুভেনের পেছনে চর লাগানোর প্রতিবাদ করেছিলেন বলে মহামন্ত্রী বৃদ্ধ শুভংকরকে বন্দী করা হল কারাগারে। রাণী হৈমবতী শোকে দুঃখে পাগলিনীর মত হয়ে গেলেন। শিখেন্দ্রর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মা ছেলেকে ডেকে পাঠালেন নিজের মহলে। শিখেন্দ্র দাসীকে অপমান করে ফিরিয়ে দিল। রাণী বুঝলেন রাজ্যের মহা সর্বনাশ উপস্থিত।

শিখেন্দ্র তার কথা রাখল! বন্ধু বুদ্ধিধর হল তার মহামন্ত্রী। রাজা হয়ে যা যা করার ছিল তার কিছুই সে বাকি রাখল না। আয়েসে গা ঢেলে দিল, মাতল শিকারের আনন্দে। আক্রমণ করল প্রতিবেশী রাজ্য। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল চারিদিকে। অকারণে নিরীহ মানুষের রক্তে ভিজে গেল মাটি।

প্রজারা তাদের আবেদন জানাতে দরবারে আসে। রাজাকে না পেয়ে ফিরে যায়। শিখেন্দ্রর বিচার করার ধৈর্য নেই। সে ভুল করে দণ্ড দিয়ে বসে নির্দোষকে। দুষ্ট লোকের শাস্তি হয় না, দুর্বল মারা পড়ে সবলের অত্যাচারে। রাজ্যে অরাজকতা,

অত্যাচারের সীমা নেই। অভিযোগ পেয়ে অস্থির শিখেন্দ্র প্রজাদের ওপর কর দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। যারা তা দিতে না পারে রাজার সৈন্য তাদের ঘরবাড়ি দেয় জ্বালিয়ে। ক্ষেতের শস্য জোর করে এনে পোরে প্রজাদের খামারে। নিরন্ন প্রজার কান্নায় ভরে ওঠে সুন্দরগড়ের আকাশ বাতাস।

* * *

সুন্দরগড়ে যখন এই অবস্থা রাজারাণীর আদরের দুলাল শুভেনকুমার তখন সুজলা নদীর তীর ছাড়িয়ে চলে গেছে অনেক দূর। দেখছে সে নানা দেশ, পাহাড় বন আর নদী। দেখছে সূর্যের উদয় কেমন সুন্দর, কেমন আশ্চর্য দূর আকাশের ধ্রুবতারার হাসি। শুনছে ঝরণার ঝরঝর, বনের মর্মর। যত দেখে শুভেন তত তার মন বলে, 'আহা এত সুন্দর ছড়িয়ে রয়েছে না দেখে বন্দী ছিলাম আমি পাথরের প্রাসাদে।' প্রতিদিন সকালে সে পিতামাতা আর গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলে, 'তোমরা আমায় আশীর্বাদ করো। আমার এ যাত্রা যেন বৃথা না যায়। আমি যেন অন্ধবনের পথ খুঁজে পাই।'

সন্ন্যাসী-বেশী রাজকুমারের চুল এখন রুক্ষ, পায়ে ধূলো কিন্তু মুখে মধুর হাসি। পাখির গান, ফুলের রং তাকে মুগ্ধ করে কিন্তু তারই মাঝে মানুষের আর্তনাদ শুনে সে ওঠে চমকে। এ কান্না তো সুন্দর-গড়ের প্রজাদের। শুনে শুভেন বড় ব্যথা পায় মনে মনে। যে কোন মানুষের দুঃখই তাকে কষ্ট দেয়। সে ভাবে আহা আমি যদি ওদের চোখের জল মুছিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারতাম।

একমাস পথ চলার পর সে তার ধনুক-বাণ রেখে দিয়েছিল পথের একধারে। দেখেছিল অস্ত্রের দরকার নেই আর। পথ চলতে চলতে যার সঙ্গেই দেখা হয়েছে শুভেনের সে তাকে মিষ্টি কথাই বলেছে। তাকে কোন দুঃখ দেয় নি কেউ। তাই সে ধনুক-বাণ রেখে

দিয়েছে পথের পাশে। তার হাতে এখন মোহনবাঁশী। সে বাঁশীর সুর শুনলে নদী তার চলা, গাছ তার পাতার সরসর থামিয়ে দেয়। তার যাদুতে তস্কর হয়ে ওঠে সাধু, বনের পশু ভুলে যায় তার হিংসে। আঁধার সরে গিয়ে দেখা দেয় আলো। দূর থেকে এই বাঁশীর সুর যারা শোনে তারা বলে, 'ওই, ওই সে আসছে!' কেউ তাকে বলে বালক সাধু, কেউ বা শুধু বাঁশীওয়ালা। বলে, 'ওরে, তোরা পথ করে দে। পথের যত কাঁটা সরিয়ে দে সব। যেন হাঁটতে কষ্ট না হয় ওর।' কেউ তাকে ফুলের মালা পরিয়ে দেয়, কেউ বা ডালায় করে এনে দেয় ফল আর মিষ্টান্ন। এই দেবদূতের মত বালককে ইচ্ছে করে ঘরে বেঁধে রাখতে কিন্তু কুমার সবাইকে কাঁদিয়ে চলে যায় আরও দূরে।

* * *

এদিকে সুন্দরগড়ে নতুন রাজার অত্যাচার ক্রমশঃ সীমা ছাড়াতে থাকে। পুরনো মন্ত্রী, অমাত্যেরা সকলেই এখন কারাগারে। পথে ঘাটে প্রজাদের মুখে এখন একটাই কথা—শিখেন্দ্রকুমারকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে বড়কুমারকে বসাতে হবে সেখানে। শিখেন্দ্রর সব কাজে এখন সহায় মহামন্ত্রী বুদ্ধিধর। রাজবাড়ির সুখাদ্য খেয়ে খেয়ে তার বপুটি এখন আগের চেয়ে বিশাল হয়েছে। সে শিখেন্দ্রকে মন্ত্রণা দিয়েছে প্রজারা যে তার প্রতি সন্তুষ্ট নয় তার জন্য দায়ী বড়কুমার। তলে তলে সে-ই ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের। শিখেন্দ্ররও সেইরকম সন্দেহ হয়। সে চতুর্দিকে সৈন্য পাঠায়। হুকুম দেয় বড়কুমারকে যেখানে পাওয়া যায় যেন ধরে নিয়ে আসা হয়। সৈন্যরা ঘোড়া ছুটিয়ে, তীর ধনুক হাতে ধেয়ে যায় বনে, প্রান্তরে, পর্বতগুহায়। খোঁজ করে ফেরে বড়কুমারের। ভুল করে ধরে নিয়ে আসে তারা অন্য সাধু কি পথচারীকে। শিখেন্দ্র রেগে সৈন্যদের ওপর তর্জন করে। এমন সময় খবর আসে হিমঝোরা নামে ঝরণার কাছে

দেখা গিয়েছে এক কিশোর সন্ন্যাসীকে।

দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে সৈন্যদল রওনা হয়ে যায় তখনই। তন্ন তন্ন করে খোঁজে পাহাড়-চূড়া, ঝরণার উৎস। কিন্তু কারুর দেখা মেলে না। তারা সেখানে যাওয়ার আগেই বড়কুমার সে জায়গা ছেড়ে এগিয়ে গিয়েছে আরও সামনে। শিখেন্দ্র রাগে অস্থির হয়ে ওঠে। চরের দলকে সে পাঠায় নানা দিকে। তারা ফিরে এসে বড়কুমারের কোন খবর দিতে না পারায় সে রাগে অন্ধ হয়ে সর্দার-চরকে আগুনে নিক্ষেপ করার হুকুম দেয়। একদিকে প্রতি-হিংসার আগুন, অন্যদিকে দুঃখী মানুষের হাহাকারে সুন্দরগড়ের আকাশ বাতাস কালো হয়ে উঠতে থাকে।

মহারাজ চন্দ্রকেতু মারা যাওয়ার পর হৈমবতীর দিন যেন আর কাটতে চায় না। একা একা নিজের ঘরে বসে চোখের জল ফেলেন তিনি দিনরাত। কখনও তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক সুন্দর বালকের মুখ ; কাকচক্ষু জলের ওপর সূর্যের কিরণ পড়লে যেমন ঝিকমিক করে তেমনি তাঁর দুঃখী মনের পটে কুমারের মুখ ভেসে উঠে তাঁকে আনমনা করে দেয়।

একদিন এইরকম কুমারের কথা ভাবতে ভাবতে রাণী ঘুমিয়েছেন হঠাৎ তার মধ্যে স্বপ্ন দেখলেন সেই ঋষিকে। তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে। বলছেন, 'তোর ছেলে বনে গেছে বলে দুঃখ করিস না। সে খুব বড় একটা কাজ করে আসবে। তুই ভাগ্যবতী।' রাণী অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন। ঋষির মুখে কী মধুর হাসি। ঋষি বললেন, 'তোর ছেলে জয়ী হবে। তবে তার একার চেষ্টায় নয়।'

—কে তাকে সাহায্য করবে ? রাণী ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করেন।

—ছোটকুমার।

হৈমবতী অবাক হয়ে বলেন, 'সেকি! সে তো অবাধ্য, অত্যাচারী। সে কি করে এই মহৎ কাজে অংশ নেবে ?'

ঋষি হাসলেন। বড় প্রশান্ত আর সুন্দর দেখাল তাঁর মুখ।

বললেন, 'সংসারে পাপীদেরও কিছু করার থাকে। জগৎসংসারের অনেকখানি ভার তারাও বইছে। তার যতটুকু করার সে ঠিকই করবে। দরকার হলে নিজের জীবন দিয়েও।'

রাণীর বুক ছাঁৎ করে ওঠে। তিনি যে মা। তাঁর মমতা দুজনের প্রতিই সমান। মহাতেজা ঋষির মুখ মিলিয়ে যায়। তার আগে তিনি বলে যান, 'দুই ছেলের মধ্যে ফিরে পাবি তুই একজনকে। দুঃখ তোর এইটুকুই।'

রাণী আঁতকে ওঠেন। এ-কি স্বপ্ন দেখলেন তিনি! স্বপ্নের প্রথমে আনন্দ পরে দুঃখ! রাণী অস্থির বোধ করেন। পুবের আকাশ তখন সবে ফিকে হয়েছে। রাণী তখনই দাসীদের আদেশ করেন শিখেন্দ্রকে ডেকে আনতে। কিছু পরে মাথায় মুকুট, হাতে তরোয়াল শিখেন্দ্র এসে দাঁড়ায় সামনে। তার মুখে দুঃশ্চিন্তার ছায়া, চোখে অনিদ্রার কালি। রাণীর কষ্ট হয় ছেলের মুখের পানে চেয়ে। কতদিন পরে দেখা পেলেন মা ছেলের।

'এ-কি চেহারা হয়েছে তোর হ্যাঁ রে?' কাছে গিয়ে শুধোন রাণী। এত অত্যাচার করিস কেন শরীরের ওপর? কিসের এত ভাবনা তোর?

—ভাবনা তোমার বড় ছেলের জন্যে মা, শিখেন্দ্র গরগর করে রাগে। 'আমি রাজা হয়েছি বলে দাদার এত হিংসে যে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে আমার বিরুদ্ধে', শিখেন্দ্রর দুচোখে যেন আগুন ঝিলিক দেয়, 'ঠিক আছে। আমিও তাকে ছেড়ে দেব না। রাজদ্রোহের শাস্তি সে পাবে।'

অত দুঃখের মধ্যেও রাণীর হাসি পায়। বলেন, 'তুই কি পাগল হলি! যে হাসতে হাসতে তোর জন্যে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে গেল সে কি-না করবে তোর সঙ্গে শত্রুতা! তোর নিশ্চয় বুদ্ধিলোপ পেয়েছে।'

শিখেন্দ্র মাথা নেড়ে গম্ভীর গলায় বলে, 'আমার সন্দেহ ঠিক।

তা ছাড়া বুদ্ধিধর আমায় বলেছে। দাদার সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া উপায় নেই আমার। সে ভুলে গেছে আমি রাজা। বিদ্রোহীর শাস্তি মৃত্যু!'

শুনে রাণীর বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায়। তবে কি সত্যি সত্যি ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ হবে? ছেলের হাত ধরে তিনি উঠে বলেন, 'খবরদার, ওকথা মুখে আনবি না। তুই রাজা হলেও জানবি সে তোর বড় ভাই। অনেক ভাগ্যে এমন দাদা পেয়েছিস। তার সম্বন্ধে এমন হীন ধারণা করলে নিজেরই দুঃখ ডেকে আনবি।'

হৈমবতী আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু শিখেন্দ্রর তা শোনার ধৈর্য ছিল না। মায়ের হাত ছাড়িয়ে ঝড়ের বেগে সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। রাণী পেছনে ডাকেন সে শোনে না। রাণীর চোখের কোলে জল ওঠে দুলে। স্বপ্নের ঋষি বলেছিলেন, 'একজনকে ফিরে পাবি।' তবে কি শিখেন্দ্র হত্যা করবে শুভেনকে? একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাণী চোখে অন্ধকার দেখেন। কাতর আর্তনাদ শুনে দাসী ছুটে আসে। দেখে রাণী জ্ঞান হারিয়েছেন। পাথরের মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়েছে তাঁর ননীর মত কোমল শরীর। চোখ দুটি বোজা, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রাণীর শরীরে যেন প্রাণ নেই।

দাসী ছুটে গিয়ে খবর দেয় রাজসভায়। রাজবৈদ্য এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। শিখেন্দ্রকেও খবর পাঠানো হয় কিন্তু জানা যায় রাজা প্রাসাদে নেই। কিছু আগেই সেনাপতিকে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন কেউ জানে না। রাজবৈদ্য রাণীকে ভাল করে পরীক্ষা করে বলেন ছেলের দেখা না পেলে মায়ের জ্ঞান ফেরা শক্ত। পুরনারী ও আত্মীয়-স্বজনদের মাঝখানে রাণী শুয়ে থাকেন ফুলেভরা ছিন্ন মাধবীলতার মত। রাজবৈদ্য চিকিৎসা চালিয়ে যান। রাণীর শরীরে প্রাণ আছে কিন্তু জ্ঞান নেই। অসাড় শরীর, মায়ের মনের

যত স্নেহ, মায়া, মমতা সব যেন ধেয়ে চলেছে প্রিয় পুত্রের খোঁজে।

* * *

পথের যেন শেষ নেই। এত পথ চলেছে কুমার তবু যেন কত বাকি রয়ে গেছে। পৃথিবীটা যে কত বড় তা পথে না বেরুলে বুঝি বোঝা যেত না।

এতদূরে এসেও কাদের কান্না এসে বাজে বড়কুমারের কানে। কান পেতে শুনে কুমার বোঝে এ সুন্দরগড়ের মানুষের কান্না। তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিসের দুঃখ ওদের? দেবতার মত উদার পিতা, নদীর মত স্নেহময়ী মা, লক্ষ্মণের মত সুশীল ভাই। তবু ওদের কিসের দুঃখ? মাথা নীচু করে হাঁটে কুমার। চিন্তায় আচ্ছন্ন তার মন।

হঠাৎ আকাশে ছায়া ঘনায়। মেঘে মেঘে ডমরুধ্বনি বেজে ওঠে। কুমার মুখ তুলে সামনে তাকায়। বারেকের জন্যে চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার। ওই দেখা যায় অন্ধবন। কালো মেঘ, কালরাত্রি বুঝি বা তারও চেয়ে কালো ওই অন্ধকার মহাদেশ। কুমার স্বস্তিবোধ করে। আর দেরী নেই। যাত্রার শেষ হয়ে এসেছে। কুমার তাড়াতাড়ি পা চালায়।

সে রাত্রে ঘুমের মধ্যে শিখেন্দ্র এক স্বপ্ন দেখে। বড়কুমার দাঁড়িয়ে তার সামনে। মুখে শান্ত হাসি। মাথায় ঋষি-বালকের মত জটা। বিশাল দুই চোখ মেলে সে তাকিয়ে আছে ছোট ভাইয়ের মুখের দিকে। বড়কুমার তাকে বলছে, 'আমি নিজের ইচ্ছেয় সিংহাসন ছেড়ে চলে গিয়েছি বলে তুমি পেয়েছ তা। যেদিন আমি ফিরে আসব সেদিন প্রজারা যদি চায় তবে তোমাকে সরিয়ে রাজা হব আমি।' তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করার মত গুণ গুণ করে সে বলে, 'ভাই ভালবাসো, হিংসে ভুলে যাও। তাতে তোমার শান্তি, প্রজাদেরও মঙ্গল।'

শিখেন্দ্রর ঘুম ভেঙ্গে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে, 'শয়তান এখনও তুমি আমার পেছনে লেগে আছো? ভাই না, তুমি শত্রু আমার। তুমি বেঁচে থাকতে আমি কখনও হিংসে ভুলতে পারি না।' শিখেন্দ্র বুঝতে পারে বড়কুমারকে হত্যা না করা পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। আর এ কাজ করবে সে নিজের হাতে। সেনাপতি ময়ূরকণ্ঠ, চর সর্দার গোপীনাথ কাউকে সে বিশ্বাস করে না। এমন কি কিছুদিন ধরে বুদ্ধিধরকেও সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে সে। শিখেন্দ্রর ভয় বুদ্ধিধর যদি ময়ূরকণ্ঠকে হাত করে তাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেয়। শিখেন্দ্র জানে বাহুবলই একমাত্র বল। যার হাতে তরোয়াল, সিংহাসন তার। সৈন্যরা যার কথা শুনবে রাজমুকুট শোভা পাবে তারই মাথায়। ছোটকুমার বোঝে তার প্রধান শত্রু এখন বড়কুমার। আগে তাকে বন্দী করা তারপর বুদ্ধিধরের সঙ্গে বোঝাপড়া।

পরদিন সকালে যুদ্ধসাজে প্রস্তুত হয় শিখেন্দ্র। প্রিয় ঘোড়া জীবকের পিঠে সওয়ার হয়ে যাবে সে শুভেনের খোঁজে। তার সঙ্গে হবে মরণপণ লড়াই। সবে শিখেন্দ্র প্রাসাদ চত্বরে পা দিয়েছে এমন সময় অলিন্দ থেকে বুদ্ধিধর তাকে দেখতে পায়। বেলায় শয্যাত্যাগ করা অভ্যাস বুদ্ধিধরের। আজ চরের মুখে খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে চোখ কচলে সে দেখতে পায় রাজা বাইরে চলেছেন যুদ্ধসাজে। তাড়াতাড়ি নেমে আসে সে নিচে।

—এত সকালে কোথায় চলেছ বন্ধু? শিখেন্দ্রর কাছে এসে প্রশ্ন করে বুদ্ধিধর।

—বন্ধু নয়, বলো রাজা। সগর্জনে জবাব দেয় শিখেন্দ্র।

চতুর বুদ্ধিধর সহজে রাগে না। হেসে বলে, 'আগে তো বন্ধুই ছিলে আর এই বন্ধুর পরামর্শেই রাজা হয়েছ, তা ভুলে যাচ্ছ কেন?'

শিখেন্দ্র তেমনি তেজের সঙ্গে বলে, 'পুরনো কথা এখন থাক।

কি বলতে চাও তাই বলো।'

নকল ভক্তি দেখিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে শিখেন্দ্রকে অভিবাদন করে বুদ্ধিধর প্রশ্ন করে, 'জানতে পারি কি রাজামশাই চলেছেন কোথা ?'

গম্ভীর স্বরে শিখেন্দ্রর জবাব, 'চলেছি বিশেষ কাজে। কারণটা গোপনীয়, এইমাত্র জেনে রাখো।'

শুনে বুদ্ধিধর ঘাড় হেলিয়ে বলে, 'ঠিক আছে। আমার সে জানার দরকার নেই। কিন্তু একটা কথা বলতে চাই যেখানেই যাও সাবধানে যেও। রাজ্যের চারদিকে আগুন জ্বলছে। বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে গ্রামে গঞ্জে, তাই বলি সাবধান।'

শিখেন্দ্র তখন জীবকের পিঠে। কোষ থেকে তরোয়াল তুলে শূন্যে আস্ফালন করে বলে, 'আমি জানি কে এই বিদ্রোহের পেছনে। তাকে দমন করতেই যাচ্ছি আমি। আমার আর কোন পরামর্শে দরকার নেই।'

বুদ্ধিধর কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই ঘোড়ার খুরে ধূলো উড়িয়ে বেরিয়ে যায় শিখেন্দ্র। সেই ধূলোর মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুদ্ধিধর সংকল্প নেয় আজ শিখেন্দ্র তাকে যে অপমান করে গেল তার শোধ সে নেবে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দিয়ে সে দ্বারীকে ডাকে।

দ্বারী ছুটে এসে জোড়হস্তে নমস্কার করে। 'আমার ঘোড়া তৈরি করতে বল,' হুকুম দেয় বুদ্ধিধর, 'আর সেনাপতিকে বল আমি ডেকেছি তাকে। শীগগির।'

—যো হুকুম, বলে দ্বারী চলে যায়।

বুদ্ধিধর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেই পথের দিকে তাকিয়ে যেখান দিয়ে শিখেন্দ্র ঘোড়া ছুটিয়ে গেছে একটু আগে। আজ বড় অপমান করেছে শিখেন্দ্র তাকে। সে অপমানের প্রতিশোধ নেবে বুদ্ধিধর।

আর তারও তো স্বপ্ন ছিল একদিন সুন্দরগড়ের রাজা হয়ে বসার ! কে জানে, হয়ত এই প্রতিশোধ নেওয়ার মধ্যে দিয়ে সে স্বপ্ন সত্যি হয়ে উঠবে।

'তাড়াতাড়ি আমার ঘোড়া নিয়ে আয়', বুদ্ধিধর ব্যস্তভাবে হাঁক দেয়, 'অস্ত্রনিয়ে আয় শীগগির।'

* * *

পাহাড়, বন, নদী পেরিয়ে চলেছে শিখেন্দ্রকুমার ; জীবক ক্লান্ত হয়ে পড়লেও তার চলার বিরাম নেই।

যেখানেই মানুষের দেখা পায় সে সেখানেই শোনে এইমাত্র এখান থেকে চলে গেছে একজন পথিক যার পোষাক সন্ন্যাসীর কিন্তু মুখে রাজার মহিমা। সে সবাইকে শুনিয়ে গেছে তার বাঁশী। লোকে সে সুর শুনে কেঁদেছে, আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে তাকে। কিন্তু পথিক ধরা দেয় নি। চলে যাওয়ার আগে সবার মুখের পানে তাকিয়ে সে বলেছে, 'ভালবাসো।'

জনে জনে যখন তাকে শুধিয়েছে সে কোথায় চলেছে পথিক জানিয়েছে সে চলেছে অন্ধবনের পথ খুঁজতে। শুনে ভয় পেয়েছে মেয়েরা, বৃদ্ধেরা তাকে বারণ করেছে, যুবকেরা তার সঙ্গী হতে চেয়েছে কিন্তু পথিক জানিয়েছে তাকে যেতে হবে একাই।

শিখেন্দ্র বোঝে এ বড়কুমারই। সে পাগলের মত তার পায়ের চিহ্ন খুঁজে ফেরে। পথ কখনও সমতলে কখনও পাহাড়ের ধার ঘেঁষে। শিখেন্দ্র ক্লান্ত বোধ করে তবু বড়কুমারকে হত্যা না করা পর্যন্ত শান্তি নেই তার। সে মনে করে শুভেনকুমারকে বধ করতে পারলেই সিংহাসন নিরাপদ হবে, প্রজাদের বিদ্রোহ হবে শান্ত আর এই যে বেরিয়েছে সে পথে এই সঙ্গে অন্ধবনের পথও সে খুঁজে বার করবে, দেখিয়ে দেবে শুভেন যা পারে নি তা সে কত সহজে করতে পারল।

একদিন বেলা দুপুরে ক্লান্ত হয়ে সে ঘোড়া থামিয়েছে বনের মধ্যে এমন সময় নিস্তব্ধ গাছগাছালির মধ্যে সে শুনতে পায় ঘোড়ার খুরের শব্দ। বন কাঁপিয়ে যেন ছুটে আসছে কারা! সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয় শিখেন্দ্র। তার মন বলে এ শুভেন। ধনুকে বান লাগিয়ে প্রস্তুত হয় শিখেন্দ্র। দুই চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে তার। মনে মনে শিখেন্দ্র বলে, 'রাজ্যিসুদ্ধ লোক জানে তুমি নিজের ইচ্ছায় আমাকে সিংহাসন দান করে সন্ন্যাসী হয়েছ। আর এখন বনের মধ্যে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে আসছ আমার সঙ্গে। এই তবে তোমার আসল পরিচয়, দাদা। এসো তবে, গুরুর কাছে কে কেমন অস্ত্রশিক্ষা করেছে দেখা যাক।'

পরক্ষণে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ঘোড়ার পিঠে চেপে এগিয়ে আসছে বুদ্ধিধর। সঙ্গে জনাদশেক সৈন্য হাতে উদ্যত বর্শা তাদের। চোখে চোখ পড়তে কুটিল হাসি হেসে বুদ্ধিধর বলে, 'এত সহজে তোমার দেখা পাওয়া যাবে ভাবিনি বন্ধু। ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় এগিয়ে গিয়েছ আরও অনেক দূরে।'

গর্জে ওঠে শিখেন্দ্র বলে, 'কার অনুমতি নিয়ে তুমি প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়েছ বুদ্ধিধর?'

বাঁকা হাসি হেসে বুদ্ধিধর জবাব দেয়, 'বুদ্ধিধরের কারু অনুমতি নিতে লাগে না, রাজা। আর শোনো, এই শেষবার আমি তোমাকে রাজা বলে সম্বোধন করলাম। আর কেউ তোমায় তা বলবে না। তারপর সৈন্যদের দিকে ফিরে হুকুম দেয়, 'বন্দী করো ওকে।'

দাঁতে দাঁত চেপে শিখেন্দ্র বলে, 'শয়তান, তোর এই মতি।' তারপরই সে বাণ ছোঁড়ে। গর্জন করে বাণ যায় ছুটে। বুদ্ধিধরও সঙ্গে সঙ্গে নিক্ষেপ করে বর্শা। কিন্তু শিখেন্দ্র অনেক নিপুণ যোদ্ধা। বর্শা লক্ষ্যে পৌঁছনোর আগেই সে সরে যায়। আর তার নিক্ষিপ্ত বাণ সোজা গিয়ে লাগে বুদ্ধিধরের বুকে। যন্ত্রণায় ছটফট করে তখনই মারা যায় সে। তার হাতের বর্শা লেগেছিল জীবকের গায়ে। আর্তনাদ

করে উঠে জীবক যায় পড়ে। শিখেন্দ্রর সেদিকে লক্ষ্য নেই। সে বৃষ্টির মত বাণ নিক্ষেপ করে বুদ্ধিধরের সৈন্যদের দিকে। মুহূর্ত্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে সৈন্যরা যে যেদিকে পারে পালায় ছুটে। ক্লান্ত শিখেন্দ্র গলার ঘাম মুছে বলে, 'এক শত্রু শেষ হল, এবার আর একজনের পালা।'

জীবক মারা যেতে শিখেন্দ্রর কিছু অসুবিধে হল। তবু সে ঠিক করে যে কাজের জন্যে এতদূর এসেছে সে তা শেষ করে তবে সে ফিরবে প্রাসাদে, নিষ্কণ্টক করবে সিংহাসন। বুদ্ধিধর ছিল তার প্রিয় বন্ধু, তাকে বধ করে আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে সে।

পায়ে হেঁটে পথ চলা সুরু হল শিখেন্দ্রর গাছের কাঁটায় তার রাজ পোষাক গেল ছিড়ে, ক্লান্ত হয়ে কতবার সে বসে পড়ল পথের ধারে তবু তার চলার বিরাম নেই। যেমন শুভেনকুমার মানুষকে তার বাঁশীর সুর শুনিয়ে ভালবাসা বিলিয়ে এগিয়ে গেছে দিনের পর দিন তেমনি উৎসাহ নিয়ে শিখেন্দ্র চলেছে একজনকে নিজের হাতে হত্যা করবে বলে। শুভেন জানেনা, তার পেছন পেছন একজন ধেয়ে আসছে খোলা তরোয়াল হাতে তার প্রাণ নিতে। সে যেমন এগিয়ে চলেছিল হাসিমুখে বন, নদী আর প্রান্তর পেরিয়ে তেমনি ভাবে চলেছে এখনও।

* * *

এদিকে বছর ঘুরে আসে। ফিরে আসে ফাল্গুন মাসের সেই দিন যেদিন শুভেন প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়েছিল পথে। সেদিনও সন্ধ্যা নামে পৃথিবীতে। দিনমণি আকাশে মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে ধ্যানে বসেন তাঁর পশ্চিম পারের রক্তবর্ণ আসনে। আজ শুভেন-কুমারের পৃথিবী প্রদক্ষিণ শেষ হওয়ার মুখে। ওই সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে আজ কুমারের মনে পড়ছে নিজের মা, বাবা, রাজকবি আর সভাপণ্ডিতের কথা। মনে পড়ছে ভাই শিখেন্দ্রকেও। বড় ইচ্ছে হয় সুন্দরগড়ে ফিরে গিয়ে সবাইকে দেখে আসতে। কিন্তু

যাওয়ার উপায় নেই। এখনও কাজ শেষ হয়নি তার। অন্ধবনের পথ খুঁজে পাওয়া বাকি এখনও। সে কাজ শেষ না করে ফিরবে কেমন করে শুভেন।

সূর্যের শেষ কিরণটি যখন আকাশের কোল থেকে মুছে যায় তখন কুমার দেখে তার সামনে অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। কালো মেঘের চেয়েও কালো, অমাবস্যার রাতের মত গাঢ় অন্ধকার এক বন তার দৃষ্টি জুড়ে থমথম করছে। কুমার বুঝল এই সেই বন যেখানে সে পৌঁছতে চেয়েছিল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কুমার ভাবে এই বন আর এই অন্ধকার ভেদ করে তাকে ভেতরে যাওয়ার পথ খুঁজে বার করতে হবে।

যেন মস্ত এক বাজপাখির ডানায় ভর দিয়ে নেমে আসছে অন্ধকার। চরাচর জুড়ে স্তব্ধতা। কুমার দেখল জায়গাটি ধ্যানের পক্ষে বড় সুন্দর। তার কোঁচড়ে ছিল এক ব্যাধের কাছ্ থেকে পাওয়া চকমকি পাথর দুটি। তা ঠুকে শুকনো পাতার রাশে ছোঁয়াতে আগুনের কুণ্ড তৈরি হল। কুমার সেই কুণ্ডের সামনে চক্ষু মুছে বসল ধ্যানে। সারাদিন পথ চলার ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙ্গে পড়তে চায়। তবু ধ্যান শেষ করতে হবে। গভীর রাতে ধ্যান শেষ হতে চোখ খুলল কুমার। হঠাৎ মনে হল কুণ্ডের ওপারে কে যেন দাঁড়িয়ে। ঠাহর করে দেখে অবাক হল কুমার। এ যে শিখেন্দ্র। কুমারের যেন বিশ্বাস হতে চায় না। কতকাল পরে দেখা। ভাইকে দেখে কুমারের ভারী আনন্দ হল। আসন ছেড়ে উঠে সামনের দিকে দু-হাত বাড়িয়ে বলল, 'এসো ভাই, ভাল আছো তো? কেমন করে এলে এতদূর?'

শিখেন্দ্রর চোখে কুটিল দৃষ্টি। বড়কুমার সামনে দু-হাত বাড়িয়েছে, সে ভাবল দাদা বোধহয় যুদ্ধে আহ্বান করছে তাকে। সে-ও তো যুদ্ধই চায়। ধনুকে বাণ জুড়ে সে জবাব দিল, 'ভাই না, আমি তোমার যম। রাজ্য ছেড়ে এসেও রাজত্ব করার লোভ তোমার যায় নি। ষড়যন্ত্র করেছ তুমি আমারই বিরুদ্ধে। তার প্রতিফল তুমি পাবে আজ। রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার শাস্তি মৃত্যু। তা

নিশ্চয় তুমি জানো। প্রস্তুত হও মত্যুর জন্যে।'

হেসে শুভেন বলল, 'ভাই, তুমি ভুল করেছ। তোমার রাজ্যে কিছু অশান্তি আছে আমি শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো তোমার বিরুদ্ধে একটি শব্দও আমি উচ্চারণ করিনি কারু কাছে। শয়নে, স্বপনে তোমার মঙ্গলই কামনা করেছি শুধু। তুমি যে আমার ভাই। আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। আমার দ্বারা তোমার কোন অমঙ্গল কি সম্ভব?'

শিখেন্দ্র সে কথায় কাণ দিল না। ধনুকে বাণ লাগিয়ে সে তা তুলে ধরল শুভেনের বুকের দিকে। শুভেনের কাছে কোন অস্ত্র নেই। কোঁচড় থেকে গুরুর উপহার সেই বাঁশী তুলে নিয়ে সুর দিল সে তাতে। শিখেন্দ্র তীর ছুঁড়ল। সে তীর ফুলের মালা হয়ে গিয়ে পড়ল শুভেনের গলায়। বাঁশী নামিয়ে শুভেন বলল, 'দেখ ভাই, তোমার জন্যে আমার মনে ভালবাসা রয়েছে, তাই তোমার তীর ফুল হয়ে ঝরে পড়ছে আমার ওপর। কিন্তু শিখেন্দ্র সে কথায় ভুলল না। সে আবার ধনুকে তীর জুড়ে ছুঁড়ল বড়কুমারের দিকে। আবারও তা হল ফুলমালা। জল-স্থল তখন শুভেনের মোহনবাঁশীর সুরে কাঁপছে। শিখেন্দ্র তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্লান্ত আর শুভেনের গলায় পৃথিবীর গাছে গাছে যত ফুল হয় তার মালা! শুভেনের মুখে হাসি, শিখেন্দ্র রাগে অন্ধ। শুভেন শান্তমুখে বলে, 'ভাই, তুমি আমায় হিংসে করছ, আমি কিন্তু তোমায় স্নেহ করি। এসো, আমার বুকে এসো। শিখেন্দ্রর তূণে আর বাণ নেই, সে খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এল, তারপর শুভেনের বুক লক্ষ্য করে তা হানতেই একরাশ চাঁপাফুল অঞ্জলির মত ঝরে পড়ল শুভেনের পায়ের ওপর। শিখেন্দ্র অবাক মেনে থ হয়ে দাঁড়িয়ে। সে শুনছে শুভেন তাকে বলছে, 'এসো ভাই, বুকে এসো।'

গর্জন করে শিখেন্দ্র বলল, 'আমার অস্ত্র নেই তাতে কি। আমার অন্তরে আছে তোমার জন্যে ঘৃণা। আমি সাপ হয়ে দংশন করব তোমায়। হে ঈশ্বর, আমার জিভে দাও মৃত্যুর চেয়ে শীতল, আগুনের

চেয়ে ভয়ংকর বিষ।' সঙ্গে সঙ্গে কালো আকাশে বিদ্যুৎ উঠল ঝলসে, বাজ হাঁকল কড় কড় শব্দে। দেখা গেল শিখেন্দ্র যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে হিস্ হিস্ করছে ভয়ংকর এক কালকেউটে। তার উদ্যত ফণা মৃদু মৃদু কাঁপছে আর দু চোখ দিয়ে বেরুচ্ছে আগুনের ঝিলিক। সেই বিষধরের দিকে চোখ রেখে কুমার দিল বাঁশীতে ফুঁ। চরাচরে যেন বসন্তের ছোঁয়া লাগল, মরণের রাজ্যে জাগল জীবনের সাড়া আর পৃথিবীর হিংস্র প্রাণীরা হিংসে ভুলে গেল চিরকালের মত। সেই বিষধর কুমারের পায়ের কাছে এসে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল অন্ধবনের দিকে। যেমন যেমন সে এঁকে বেঁকে যেতে লাগল ঘন গাছের লতাপাতার ফাঁকে তেমন তেমন তার চলার ছন্দে আঁকাবাঁকা সুন্দর পথ তৈরি হয়ে গেল বনের ভেতর। কুমার বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলল সেই পথ ধরে। হাজার হাজার গাছের ডালে পাতায় সূর্যের কিরণ এসে প্রথম চুমো খেল। পাখিরা গান গাইতে সুরু করল, কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটল, সুগন্ধে ভরে গেল দশ দিক। জমাট বরফ ঝরণা হয়ে ছুটল সাগরের সাথে মিতালী পাতাবে বলে। অন্ধবন চোখ মেলে দেখল পৃথিবীর প্রথম সকাল। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন এক পরম সুন্দর কিশোরের মাথায়।

* * *

কান্নায় ভেজা দুই চোখ নিয়ে হৈমবতী দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর মহলের জানলার ধারে। কাল ফাল্গুনী পূর্ণিমা। রাণীর মন বলছে আজ তাঁর হারানিধি ফিরে আসবে, তাঁর দুঃখের নিশি পোহাবে। হঠাৎ জয়ধ্বনি উঠল প্রাসাদ চত্বরে, 'জয় শুভেনকুমারের জয়, জয় মহারাজ…'। ওই, ওই সে আসছে। রাণী দেখলেন হাজার হাজার প্রজার সামনে দিয়ে হেঁটে আসছে শুভেন, তার হাতে বাঁশী। রাণীর যেন বিশ্বাস হতে চায় না। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। দাসীদের বলেন, 'দেখ দিকি আমি যা দেখছি তা সত্যি কিনা।' মায়ের

মহলের দুয়োরে এসে কুমার ডাকে, 'মা, আমি এসেছি।' রাণী ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে মুখে চুমো খেয়ে বলেন, 'বাবা, আমি যে তোর পথ চেয়েই বসেছিলাম। প্রাণটা ধরে রেখে-ছিলাম কেবল তোকে দেখবার আশায়। আজ বড় ভাগ্যে ভগবান তোকে ফিরিয়ে দিলেন আমার কাছে।'

বড়কুমার মাকে প্রণাম করে। হৈমবতী তার কপালে ছুঁইয়ে দেন বিষ্ণুদেবের প্রসাদী ফুল। আলপনা আঁকা চত্বরের ওপর পা ফেলে ফেলে শুভেন গিয়ে বসে সিংহাসনে। রাজপুরোহিত মন্ত্র পড়েন, প্রজারা করতালি দেয়। পুরনারীরা উলু দেয়, দাসীরা বাজায় শাঁখ। সানাইয়ে সুর ধরে, বেজে ওঠে কাড়া-নাকারা। এত সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনি ছাপিয়ে শুভেনের কাণে বাজে অন্ধবনের পাখীদের গাওয়া সকালবেলার গান।

রাণী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। এ যেন স্বপ্নের মত মনে হয় তাঁর। না, ওই তো শুভেন। রাজদণ্ড হাতে হাসছে। ও-ই সেই নির্ভীক যে খুঁজে পেয়েছে অন্ধবনের পথ; মানুষের মন থেকে দূর করেছে ভয়। অভিষেকের পর সিংহাসন থেকে নেমে সবার আগে সে প্রণাম করে মাকে। বলে, 'মা-গো, আমি আমার ব্রত পালন করেছি কিন্তু ভাইকে ফিরিয়ে আনতে পারি নি। কিন্তু মা, অন্ধবনের পথের খোঁজ যা এতদিন মানুষের অজানা ছিল তা আমায় দিয়ে গিয়েছে সে-ই। তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আমি যতখানি পথ গিয়ে ফিরে এসেছি সে গেছে তার চেয়েও অনেক অনেক দূরে। তুমি তার জন্যে দুঃখ করো না, মা-গো।'

হৈমবতী শুভেনের গালে আদর করে চুমো খান। ছেলে অবাক হয়ে দেখে মা'র এক চোখে জল, অন্য চোখে হাসি। যেন আলো আর আঁধার, জল আর স্থল দিয়ে গড়া আর এক পৃথিবী!

পুটো ও পাহাড়ের দৈত্য

এই চূড়ামণ গাঁ। এর একদিকে বন, পাহাড় আর একদিকে পাহাড়ের বুক চিরে বেরিয়েছে ঝরণা। সেই ঝরণাই নিচে নদী হয়ে বয়ে গেছে চূড়ামণের পাশ দিয়ে। নদীর ওপর নৌকা চলে পাল তুলে, ছেলের দল সাঁতার কাটে হৈ হৈ করে। পাহাড় যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখে, সব শোনে।

ওই পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়োর ছায়াটি নিচে এসে পড়েছে একটি শিমূল গাছের গোড়ায়। পাহাড় যেন ওই ভাবেই মিতালী পাতাতে চেয়েছে সমতলের সঙ্গে। ওই শিমূল গাছের পাশেই নবীন পটুয়ার কুঁড়ে। পটুয়ার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় ওই পাহাড়। এককালে ওই পাহাড়ের ওপর রাজার এক গড় ছিল নাকি। রাজা থাকতেন সেই গড়ে। অনেক হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল, সৈন্য ছিল তাঁর। আর ছিল ফুটফুটে রাজকন্যে এক।

একদিন সে-সব গেল হারিয়ে। যেমন আকাশ অন্ধকার করে ঝড় আসে আচমকা তেমনি ভাবে হানা দিয়েছিল এক দৈত্য। ছারখার করে দিয়েছিল সে রাজার প্রাসাদ। সোনার দেশ হল মরুভূমি। আর সেই যে আদরের রাজকন্যা সে যে কোথায় গেল তা কেউ জানতে পারল না।

এসব অনেকদিনের কথা। চূড়ামণের সবচেয়ে যে বুড়ো মানুষ, সেই দখিদাদা কেবল দেখেছে সেই সময়ের কিছুটা, সে বিশ্বাস করে এসব সত্যি। দৈত্য এই সোনার দেশ ছারখার করে দেওয়ার পর চূড়ামণ যখন নতুন করে বেঁচে উঠল তখন দখিদাদা ওই পুটোর মত এতটুকু ছেলে একটা। দখিদাদা তার বাপ ঠাকুর্দার মুখে শুনেছিল রাজা আর দৈত্যের কথা। নতুন চূড়ামণে হাতি রইল না, সৈন্য রইল না। এল পাখি, গাছ আর নদী। তৈরি হল সাঁকো। এখনও হয়ত কোনদিন লোকে নদীর ধারে বালি খুঁড়তে গিয়ে পেয়ে গিয়েছে পুরনো দিনের মোহর একখানা, যাতে রাজার মুখ আঁকা, বা একটা হীরের তুল যা হয়ত ছিল রাণীর কানে। এখনও পাঠশালার কোন

পোড়ো যদি নদীর ধারে কোন একটা পাথরের ওপর বসে থাকে তবে নদীর ছল্‌ছল্‌ শব্দ ছাপিয়ে তার কানে আসে তরোয়ালের ঝন্‌ঝন্‌ বা একটি হারিয়ে যাওয়া মেয়ের কান্না।

সব তছনছ করে দেওয়ার পরেও দৈত্যের ভাল লেগে গিয়েছিল এই দেশ, দখিদাদা বলে। তাই সে থেকে গিয়েছিল ওই পাহাড়ের ওপর। দখিদাদা বলে সে এখনও আছে ওই পাহাড়ের ওপর। তার বয়স এখন কত কেউ জানে না, তাকে যে কেউ দেখেছে এমন নয়। তবু দখিদাদা বিশ্বাস করে সে এখনও আছে। আবার কেউ কেউ বলে তার মেয়ে ওই পাহাড় থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, আবার কবে মেয়েকে ফিরে পাবে সেই আশায় ও সেই থেকে রয়ে গিয়েছে ওই পাহাড়ের ওপর।

পুটো এসব গল্প শুনেছে দখিদাদার মুখে। পুটো নবীন পটুয়ার ছেলে। তার বয়স হবে বছর দশ। তার এক বছরের বড় দিদির নাম হিনি। দুজনে রিদয় গুরুমশার পাঠশালায় পড়ে। দখিদাদা ওদের সকালে দিয়ে আসে পাঠশালায় আবার দুপুরে ছুটি হলে নিয়ে আসে ফিরিয়ে। রিদয় গুরুমশায় মাটি দিয়ে নিকানো মেজের ওপর বসে যখন হিনি, পুটো আর পাঁচজন ছেলে-মেয়ে সুর করে নামতা পড়ে তখন সামনের শিরীষ গাছটার ডালে বসে কিচিরমিচির করে একঝাঁক শালিক।

দখিদাদার বয়স কত তা কেউ জানে না। ও যেন ওই পাহাড়টার মতই আদ্যিকালের। ওর গায়ের রং মিশমিশে কালো, মাথার চুল বরফের মত সাদা। আগে ভাল তাঁত বুনত বুড়ো। দখিদাদার হাতে বোনা শাড়ি নিয়ে মেয়েরা কাড়াকাড়ি করত কুশপুরের হাটে। এখন চোখে ভাল দেখতে পায় না। তবু খুব ভালবাসে বলে সময় পেলেই একটা কিছু বোনার কাজ নিয়ে বসে যায়।

দখিদাদার যত কথা পুটোর সঙ্গে। পুটোকে বুড়ো ডাকে খোকাবাবা বলে। ও বলে দৈত্যটা নাকি আছে পাহাড়ের কোন একটা গুহায়।

ও যেমন রাগী, ওর গায়ে তেমনি জোর। ও চাইলে এই গোটা চূড়ামণ চোখের পলকে গুঁড়ো করে দিতে পারে।

পুটো গালে হাত দিয়ে বুড়োর গল্প শোনে। হিনি কোলের ওপর রাখা সুতোর আসন বোনে। এমন সময় পেছনে প্যাঁক প্যাঁক ডাক শুনে চমকে ওঠে হিনি। ডাকছে পাঁচ বোন। হিনির পোষা পাঁচটি হাঁসের ওই নাম। ঠিক দুপুরবেলা ওরা নদীতে সাঁতার কাটতে যায়। সাঁতার কাটার সময় হয়ে গেলে আর ওদের তর সয় না।

হিনির যেমন পাঁচবোন, পুটোর তেমনি তিনকড়ি—তার পোষা কুকুর। পোষা বললে সব বলা হয় না, দখিদাদা বলে পোষা না গায়ের খোসা। পুটো যতক্ষণ পাঠশালায় পড়ে ও ততক্ষণ ঠায় শিরীষ গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। ছুটির ঘণ্টা পড়লে লাফায়। ডাকে ভৌ ভৌ। আগে ওর ভুলো, বাঘা এমনি কিছু নাম ছিল। সে নাম সবাই ভুলে গেছে। কি করে যেন ছোটবেলায় একটা পা কাটা গিয়েছিল ওর। চার পায়ের জায়গায় তিনটে পা ওর। সেই থেকে নাম হয়েছে তিনকড়ি।

পাঠশালা থেকে ফিরে হিনি পুটো ভাত খায়। খাওয়ার পর পুটো হাতের লেখা লেখে। তার বাংলা লেখা খুব ভাল। তিনকড়ি বসে থাকে তার পাশে। বিকেলে পুটো খেলতে যায় নদীর ধারের মাঠে। তিনকড়িও যায় পেছন পেছন। পুটোর খেলার সাথী গৌরা, রাধু আর টুকো। ওরা দু-দল হয়ে যায়। একদল পালিয়ে বেড়ায়, অন্যরা ধরতে ছোটে তাদের। দৌড়ে গিয়ে ধরা তাই এই খেলার নাম দৌড়া।

পুটো খুব ছোটে। ওর ঘন ঝাঁকড়া চুল ছোটার তালে তালে নাচে। খেলতে খেলতে বিকেল যায় ফুরিয়ে। গড়ের পাহাড়ের পেছনের আকাশটা লাল টকটকে দেখায়। ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হিনি ডাকে 'পুটো-ও-ও'। পুটো জবাব দেয়, 'যাই-ই'। পুটো

ছুট দেয়, পেছনে তিনকড়ি। পুটো এঁকেবেঁকে ছোটে, তিনকড়ি ভৌ ভৌ করে ডাকতে ডাকতে পাল্লা দিয়ে ছোটে তার সঙ্গে।

রাতে ওদের পড়া, অংক কষা শেষ হলে দখিদাদা ওদের শোনায় তার ছেলেবেলার কথা। সে-সব ছিল কি অদ্ভুত দিন। কখনও মাঝি হয়ে দাদা নৌকা বাইত নদীতে, কখনও কাঠ কাটত বনে। বয়স হতে ধরল শাড়ি আর মাদুর বোনা। নানা সুতো বুনে নক্সা করত বাহারী। এখন তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা বুড়োটা চাল বাছতে বাছতে ছড়া কাটে নিজের মনে—

হিনি পুটো, হিনি পুটো, হিনি পুটো,
চূড়ামণে থাক ভাই বোন দুটো।

শুনতে শুনতে হিনি পুটো এ ওর দিকে তাকিয়ে হাসে। হাসে দখিদাদাও। তিনকড়ি ভৌ ভৌ করে ডাকে। হয়ত ভাবে এত যখন হাসাহাসি তারও একটু ডাকাডাকি করা উচিত।

* * *

'আমায় চকমকি পাথর এনে দেবে বাবা,' সাতসকালে উঠে বায়না করে পুটো নবীন পোটোর কাছে।

'কি করবি চকমকি?' নবীন ছেলেকে আদর করে বলে, 'খেলনা চাস না, পুতুল চাস না, পাথর চাস তুই কেমন ছেলে রে!'

'আমি বেশ আলো জ্বালাব ওই পাথর ঠুকে', পুটো বলে হাসিমুখে, 'অন্ধকারে একা ভয় করবে না আমার। দেবে বাবা এনে?'

নবীন তাকিয়ে থাকে ছেলের মুখের দিকে। পুটোর চোখ দুটি টানা টানা। গায়ের রং তার মায়ের মত শ্যামলা। গলার ডাকটি যেন বাঁশীর আওয়াজের মত। হিনি পেয়েছে নবীনের সোনার বরণ রং, তার চোখও টানা। চুল ওই গড়ের পাহাড়ের চূড়োর ওপর ভেসে থাকা মেঘের মত কালো। নবীন বলে, 'দেব। যদি পাই চকমকি দেব তোকে এনে।'

নবীন তার পট, রং, তুলি গুছিয়ে নেয়। সে ঘরে বসে আঁকার কাজ করে না। সে আঁকতে ভালবাসে খোলামেলায়। তাই সকাল হতে চলে যায় বাতাসপুর। জায়গাটা চূড়ামণ থেকে তিন চার ক্রোশ দূরে। ভারী নিরিবিলি নদীর ধারে একটা পাথরের ওপর বসে আগে পট আঁকত নবীন। এখন একটা সুন্দর পাথরের ঘর হয়েছে তার। নদীর পাড়ে পাথরের ওপর বসে কাজ করতে করতে হঠাৎ ঝড়জল এলে বড় অসুবিধে হত তার। গাঁয়ের চাষারা বড় ভালবাসত নবীনকে। তারা একদিন বলল, 'এভাবে কাজ করতে তোমার অসুবিধে হয় পোটোবাবু। আমরা ঘর বানিয়ে দিই তোমাকে। এমন ঘর যার ভেতর আলো হাওয়া খেলবে।' হেসে নবীন বললে, 'বেশ'। তখন বড় বড় পাথর দেয়ালের মত সাজিয়ে আর ওপরে শুকনো ডালপালার ছাদ বানিয়ে তারা বানিয়ে ফেলল এক ঘর, যার ভেতর আলো আছে অথচ রোদ নেই, হাওয়া খেলে কিন্তু ঝড় এলে টের পাওয়া যায় না। চোখের পলকে এই আশ্চর্য ঘর তৈরি হল বলে এর নাম হল—আচমকা। নবীন খুব খুশি। এ ঘরের ভেতর থেকে সারা বছর নদী দেখা যায়, দেখা যায় আকাশ। শরতে চোখে পড়ে কাশফুলের বাহার। হেমন্তে পাকা ধানের রাশ। নবীন যখন কাজ করে তখন ছাদের ওপর মাঝে মাঝে লাফিয়ে পড়ে হনুমান। একদিন এক ইয়া বড় হনুমানই এঁকে ফেলল নবীন। নাম দিল 'পালের গোদা'। সেটা এনে দিল পুটোকে। পুটো তো ভারী খুশি। সে দিল এনে সেটা রিদয় গুরুমশাইকে। গুরুমশাই চশমার ফাঁক দিয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন, 'বাঃ বেশ। এটা থাক পাঠশালায় টাঙানো।' পোড়োদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোরা যা, এ-ও তাই।' শুনে পোড়োর দল হেসে গড়িয়ে পড়ে এ-ওর গায়ে।

পুটো তার বাবার আঁকা ওইরকম একটা পট দিয়ে আসতে চায় দৈত্যকে। দখিদাদা বলে ওর নাকি খুব একা একা কাটে। তবু পটটা দেখবে। আর পুটোরও দেখা হবে দৈত্যকে। জানবে

দখিদাদার কথা সত্যি কি-না। পুটোর যেন বিশ্বাস হয় না এতদিন পরেও দৈত্যটা রয়েছে ওই পাহাড়ের ওপর। দৈত্যটা হয়ত বাবার পটটা পেয়ে খুব খুশি হবে। বলবে, 'তুমি খুব ভাল ছেলে। আমি এখানে একা একা থাকি, কেউ আমায় দেখতে আসে না।···তোমার নাম কি ?'

একটুও ভয় না পেয়ে পুটো জবাব দেবে, 'আমার নাম পুটো।'

*　　*　　*

চূড়ামণে হৈ চৈ পড়ে গেছে। ঝামরু একটা হাতি ধরেছে। সবাই ছুটেছে তা দেখতে।

ঝামরু সাঁওতাল পাড়ার জোয়ান ছেলে। নদীর ওপারে মেঘাসোনি বনের কাছে ওর ঘর। ঝামরুর শরীর যেন পাথর দিয়ে গড়া। গায়ের রং কালো কুচকুচে, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, তাতে গোঁজা জবা ফুল। তার হাতে কখনও বর্শা থাকে, কখনও তীর-ধনুক। গত বছর পৌষালী মেলার সময় ঝামরু চূড়ামণে এসেছিল তার দলবল নিয়ে। ওর টকটকে লাল চোখ আর হাতের বর্শা দেখে বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠেছিল পুটোর ভয়ে।

হাতিরা থাকে মেঘাসোনির বনে। ধান পাকার সময় নেমে আসে ওরা লোকালয়ে। চাষীরা ওদের তাড়ানোর জন্যে রাত জাগে খেতের ধারে। হাতির পাল দেখতে পেলে ওরা পটকা ফাটায়। নিঝুম রাতে দুমদাম আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে পালায় হাতির পাল। এবার ওদের জব্দ করতে ডাক পড়ল ঝামরুর। সে সাঁওতালদের সর্দার। তার কি পটকা ফাটিয়ে হাতি তাড়িয়ে সুখ হয়। ঝামরু ঠিক করল ফাঁদ পেতে ধরবে হাতি। ধান খেতের ধারে বিরাট এক গর্ত খুঁড়ে তার ওপরে কাঠকুটো চাপা দিয়ে বসে রইল সে সারারাত। মাঝরাতে একটা বাচ্চা হাতি সেই গর্তে পড়ে আর উঠতে পারে না। হাতি গর্তে পড়তেই সে হা রে রে রে হাঁক

দিয়ে গাছ থেকে লাফ দিয়ে পড়ল বর্শা হাতে। তারপর সারারাত মাদল বাজিয়ে তার দলের সে কি নাচগান।

কি করে যেন খবর চলে যায় শহরে। পরদিন সকাল হতে দুই বাবু এসে হাজির চূড়ামণে। নিশিবাবুর পরনে ধূতি পাঞ্জাবী আর কোট পাতলুন পরা বাবুর নাম রায়সাহেব। ঝামরুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে তাঁরা বলেন, 'সাবাস সর্দার। দারুণ সাহসের কাজ করেছ তুমি। তোমার এ হাতি আমরা কিনব। শহরের চিড়িয়াখানায় হাতির ঘর খালি আজ দু বছর। এখন থেকে তোমার হাতি থাকবে সেখানে।'

ঝামরু তো অবাক। নিশিবাবু একটা হিজিবিজি লেখা কাগজে টিপসই নেন ঝামরুর। রায়সাহেব পকেট থেকে একরাশ টাকা বার করে দেন ঝামরুকে। পরদিন খাঁচাওয়ালা গাড়ি আসে শহর থেকে। সঙ্গে দশজন কুলী, বিশজন পাহারাদার। গড়গড় করে গাড়ী চেপে বাচ্চা হাতি চলে যায় শহরে। যাওয়ার আগে ঝামরুর হাত ধরে নিশিবাবু বলেন, 'এবার তুমি আমাদের বাঘ ধরে দাও, ঝামরু ভাই। শুনেছি এই মেঘাসোনির বনে আছে কালো হলুদ ডোরাওয়ালা কেঁদো বাঘ। তেমন একটা বাঘ আমাদের চাই। শহরের খোকাখুকুরা খুশি হবে। তারা জানবে মেঘাসোনিতে তাদের এক বীর বন্ধু আছে, ঝামরু যার নাম, সেই পাঠিয়েছে তাদের এই উপহার।'

গমগমে গলায় ঝামরু বলে, 'দেব বাবু বাঘ ধরে। বাঘ ধরা খুব কঠিন। তবু আমি ধরব বাঘ। শহরের খোকাখুকুদের মুখে হাসি ফোটাতে যদি প্রাণ যায় তবে তাতে দুঃখ নেই।'

'হাতিটা এখন কেমন আছে শহরে, ও দখিদাদা?' রাতে পুটো শুধোয় বুড়ো দখিদাদাকে।

পিদিমের আলোয় দখিদাদার মুখটা থমথমে দেখায়। 'কেমন আর,' বলে দখিদাদা, 'আটকা থাকতে আর কার ভাল লাগে! খাঁচার পাখির আকাশ দেখে মন কেমন করে, বনের পশু ফিরে যেতে চায় নিজের ঘরে। ছুটির পর তুমি যেমন ভালবাসো বাড়ি ফিরে

খেলতে, তেমনি পশু-পাখিও থাকতে চায় খোলামেলায় তাদের নিজেদের জায়গায়।'

বনে এক পরী আছে দখিদাদা পুটোকে বলেছিল একদিন। তার যেমন রূপ, তেমনি তার মনে দয়া। বনের সব পশুপাখি তার ছেলেমেয়ের মত। শিকারীর তীর খেয়ে কোন পাখি কি পশু জখম হলে, বা ফাঁদে ধরা পড়লে নাকি সেই পরী কাঁদে। রাতে শুয়ে শুয়ে সেই কথা মনে পড়ে পুটোর। পুটো কান পাতে। না কেউ কাঁদে না। শুধু গাছের পাতা সরসর করে, ছল্‌ছল্‌ করে নদী। হয়ত সেই পরী দুঃখ পেয়েছে বলেই এমন মন কেমন-করা বাতাস বয়, নদী আকুল হয়। পুটো ভাবে যেদিন তিনকড়ির একটা পা কাটা গিয়েছিল সেদিনও কি ওই পরীর মন কেঁদেছিল এমনি করে!

* * *

কু কু, ঝিক ঝিক, গুম গুম—পুটো আওয়াজ শুনে দুহাতে জড়িয়ে ধরে দখিদাদাকে। ওদিকে কালো ধোঁয়ায় আকাশ গেছে ছেয়ে। গাঁক গাঁক করতে করতে যেন এগিয়ে আসছে খ্যাপা দৈত্য। ভয়ে দখিদাদার বুকে মুখ গোঁজে ছেলে। হেসে পুটোর পিঠ চাপড়ে দিয়ে দখিদাদা বলে, 'অত ভয় কিসের এ্যাঁ। ও তো রেলগাড়ি।'

কতদিন ধরে পুটো শুনছিল রেলগাড়ি আসবে, রেলগাড়ি আসবে। আজই প্রথম তা দেখতে পেল সবাই। বেশ ক'মাস আগে কুলীর দল এসেছিল চূড়ামণে। বন কাটছিল তারা। তারপর এল লোহার পাত। সে হয়ে গেল কতদিন। চূড়ামণের লোক তখন ভীড় করে দেখত কুলীদের কাজ। তখনও কেউ ভাবতে পারেনি সত্যি সত্যি একদিন রেলগাড়ি চলবে এই চূড়ামণের ওপর দিয়ে।

রাতে নবীন পোটো বাড়ি ফিরলে পুটো ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বাবা, তুমি চড়েছিলে রেলগাড়ি?'

'হ্যাঁ, নবীন হেসে জবাব দেয়,' এই তো রেলে চড়েই ফিরলাম বাড়ি।'

'তোমার ভয় করল না?'

'কেন ভয় কিসের', নবীন হাসে, 'এখন থেকে রোজ রেলে চড়েই যাব, আসব। তুফান বুড়ো হয়েছে, এখন ওর আরামের দরকার।'

পুটো অবাক হয়। তাহলে রেলকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এখন থেকে কত লোক রেলে চড়ে। বাতাসপুরে হাট বসে প্রতি শনিবার। সেই হাটে কি কুশপুরের হাটে বেচাকেনা করার জন্যে কত লোক নিয়ে যায় কত জিনিস। রাখাল জেলে, গোপাল মাঝি এমন কি গৌরার দাদুরও রেলগাড়ি চড়া হয়ে গেছে। পুটোর খুব ইচ্ছা করে একদিন রেলগাড়ি দেখে আসতে। রাতে দখিদাদা যখন লণ্ঠন হাতে বাবাকে আনতে যায় তখন পুটো বায়না করে সঙ্গে যাবে বলে। দখিদাদা বলে, 'না তুমি ঘরে থাকো, নইলে হিনি ভয় পাবে।'

পুটোর এখন থেকে থেকে মনে হয় দৈত্যটার কথা। তার ভয় হয় এবার ও হয়ত একদিন নেমে আসবে ওপর থেকে। কতদিন আর একা একা থাকবে ওপরে। নেমে যদি আসে তবে কি যে হবে ভাবতেই পুটোর বুক ঢিপ ঢিপ করে। হয়ত রেলগাড়িটাই উল্টে ফেলে দিতে চাইবে ও প্রথমে। রেলগাড়ির সঙ্গে দৈত্যের লড়াই হলে কে জিতবে তা নিয়েও পুটো ভাবে খুব।

দখিদাদা হেসে বলে, 'তুমি তো সাহসী ছেলে। যদি নেমে আসে তবে তুমি রুখে গিয়ে দাঁড়াবে সামনে। পারবে না?'

না পুটো ভয় পাবে না। পুটো জানে সে চিরদিন এমন ছোট থাকবে না। বড় হয়ে সে যাবে ওই পাহাড়ের ওপর। যাবে তুফানের পিঠে চড়ে। পেছন পেছন তিনকড়ি আসবে ঠিক। পুটো খুঁজে নেবে তুটো চকমকি পাথর। যখনই অন্ধকার হবে তখনই

পুটো পাথর দুটো ঠুকে আলোয় পথ চিনে নেবে। তারপর দাঁড়াবে গিয়ে তার সামনে।

সে আর হিনি এখন পড়া করে। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে পুটো জানলা দিয়ে তাকায় বাইরে। পুব থেকে উত্তর থমথম করে কালো পাহাড়। দখিদাদা বলে, 'ওই পাহাড়ের সাতটা গুহার একটায় থাকে সেই দৈত্য।' দৈত্যটা যে এখনও আছে তা নিয়ে দখিদাদার মনে কোন সন্দেহ নেই। পুটো একটা একটা করে গুহার মুখের কাছে গিয়ে ডাকবে, 'এই যে শোনো।'

শুকনো পাতার রাশ মাড়িয়ে কারা যেন আসছে এদিকে। পুটো পড়া ছেড়ে বাইরে আসে বেরিয়ে। ওই তার বাবা, পাশে আলো হাতে দখিদাদা। পুটো ছুটে যায়। হাতের ঝোলা দখিদাদার হাতে তুলে দিয়ে দু হাত বাড়িয়ে পুটোকে কোলে তুলে নেয় নবীন পটুয়া।

পুটো মুখ লুকোয় বাবার বুকে। বাবা যেন কি! সে কি এখনও ছোটটি আছে নাকি! কদিন পরেই তো সে যাবে পাহাড়ের ওপর।

'বাবা, তুমি রেলগাড়ি চড়ে এলে?'

নবীন কি জবাব দেয় পুটোর কানে যায় না। সে এখন শুনছে দূর থেকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়া গুম গুম, ঝিক ঝিক শব্দ। ওই রেলগাড়ি চলেছে চূড়ামণ ছাড়িয়ে আরও দূরে। ওদিকে মেঘাসোনির বন লতা পাতায় ঘন, শাল আর শিরীষ গাছের জটলা। সে-সব ছাড়িয়ে রেল চলে যায় আরও দূরে। কে জানে কোন অজানা দেশে। যে দেশে গিয়েছে এই নদী, সেই নদীর পাশ দিয়েই চলেছে এই রেল। এই রাতে বোধহয় সব মিলেমিশে যায়। বন, নদী আর রেল। নদী আর রেলগাড়ি দুটোই চলে ফেরে, বন শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। হয়ত এরা দুজনে বলে তারা কোথা যায়, কি কি দেখে। বন সব শোনে চুপচাপ।

পুটো এখন বই নিয়ে আসবে। বাবাকে শোনাবে সে কি পড়া শিখেছে আজ। তারপর লিখবে হাতের লেখা। বাবার ছবির মত লেখার ওপর দাগা বুলোবে সে। এইভাবে একদিন তার লেখাও ভাল হবে। পুটো এরপর পট আঁকতে শিখবে। যাবে বাতাসপুর কি আরও দূর দেশে। সবার আগে তাকে বড় হতে হবে।

* * *

পুটো এতগুলো হাতি এই প্রথম দেখল। এক, দুই, তিন, পুটো গুনে দেখল মোটমাট পাঁচটা। গলায় ঘণ্টা বাজাছে ঢং ঢং ঢং। সে আওয়াজ ছড়িয়ে যায় নদীর ওপারে, পাহাড়ের গায়ে লেগে ফিরে আসছে আবার চূড়ামণে।

শুধু হাতি নয়, রয়েছে ঘোড়া, বাঁদর আর ভালুক। ওমা কতটুকুন একটা লোক। তার পাশে চলেছে একজন সে আবার তেমনি লম্বা চওড়া। এর মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পাকানো গোঁফ, গায়ে রং-চংয়ে জামা। সে থেকে থেকে বুকে চাপড় মারছে আর বলছে, 'ইয়া, ইয়া!' ওরা সার বেঁধে চলছে পথ দিয়ে, চূড়ামণের লোক দেখছে তাদের ভীড় করে। এরা বাঘ, সিংহ, হাতি, মানুষের মজার খেলা দেখায়, নাম মজারু কোম্পানি। চূড়ামণে এসেছে তাঁবু ফেলে খেলা দেখাবে বলে। গৌরা পুটোর কানে কানে বলে, 'ওই যে এতটুকুন লোকটা, ওর নাম লখাই। ও হল মজারুর ভাঁড় আর ওই লম্বা চওড়া লোকটা হল জগুলাল। ও বাঘের খেলা দেখায়।'

কী মজা, কী মজা! ঘরে ফিরে পুটো বাড়িময় ছুটোছুটি লাগিয়ে দেয়। হিনিও খুব খুশি। বাবা রাজি হয়েছে তাদের মজারুর খেলা দেখাতে নিয়ে যাবে। কতদিন তারা একসঙ্গে কোথাও যায়নি। শুধু মজারুর খেলা দেখার জন্যেই তো নয়, ওই তাঁবুর চারধারে বসেছে জমজমাট মেলা। সেখানে পাওয়া যায় পুতুল, বল, লাট্টু আর

ঘুড়ি। চড়া যায় নাগরদোলা। খেতে ইচ্ছে হলে মেলে নকুলদানা, তিলের বরফি, আরও কত কি! তাই পুটো খুব খুশি। তার মাটির ভাঁড়ে যে পঞ্চাশটা পয়সা জমেছে তা সব খরচ করে ফেলবে সে যা খুশি তাই কিনে।

দৈত্য কি এই সব দেখে? পুটো হঠাৎ পাহাড়ের দিকে তাকায়। ও তো বড় চূড়োটার পাশ দিয়ে মুখ বাড়ালে সব কিছু দেখতে পায়। ওর চোখের সামনে এই যে চূড়ামণে এত বাড়ি, ঠাকুরদালান, পাঠশালা এসব দেখে ওর কি রাগ হয়?

'দৈত্যটা কি সত্যি আছে, ও বাবা?' একদিন পুটো জিজ্ঞেস করেছিল তার বাবাকে। সকাল থেকে বৃষ্টি নেমেছিল বলে পোটো সেদিন যেতে পারেনি বাতাসপুর। ঘরে বসেই করছিল আঁকাজোকা।

'না ওটা একটা গল্প শুধু', জানলা দিয়ে পাহাড়টার দিকে একবার তাকিয়ে পটে তুলির টান দিয়ে জবাব দেয় নবীন পোটো, 'সত্যি হল পাহাড় আর ওই নদী।'

পুটো খুশি হয় না একথা শুনে। সে এতদিন ধরে শুনে এসেছে কালো পাহাড়টার ওপর থাকে এক দৈত্য। বাবা কেন তা সত্যি বলে মানে না। দখিদাদা তো কত জানে। দখিদাদা কি না জেনে বলেছে একথা?

নবীন মন দিয়ে পট আঁকে। পুটো সরে আসে জানলার দিকে। পুটোর মন বলে ও আছে। পুটো তার মাকে দেখেনি, তবু তো তার মা ছিল। দখিদাদার মুখে কত কথা শুনেছে মায়ের। দৈত্যকে দেখা যায় না বলে সে নেই এ কেমন করে সত্যি হতে পারে।

পুটো একদিন যাবে ওর কাছে! তুফানের পিঠের ওপর চড়ে। তুফানের খুরের আওয়াজ পেয়ে গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দৈত্য হাঁক দেবে, 'কে তুমি?'

'আমি পুটো। ওই যে শিমুল গাছটার কাছে একটা ছোট কুঁড়ে দেখা যায়, ওখানেই থাকি আমি।'

'তুমি এতদূর এসেছ! তোমার ভয় করে না?'

'উঁহু।'

দৈত্য পুটোকে দেখে। কতটুকু ছেলে আবার চড়েছে একটা ঘোড়ার পিঠে।

হঠাৎ পুটো বলে, 'আমি তোমার মেয়েকে খুঁজে এনে দেব।'

শুনে দৈত্য চমকে ওঠে। বড় বড় চোখ মেলে তাকায় তার দিকে। বলে, 'তুমি পারবে? সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ। আমি অনেক দূর যাবো। সবাইকে শুধাবো। কেমন দেখতে বল তো তাকে?'

দৈত্য নিচের দিকে দেখে। দেখে নদী, গাছপালা। বলে, 'তুমি ফুল দেখেছ? সে তার মত। ওই যে নদী, সে তারও মত।'

'তাহলে ঠিক পারব' পুটো ঘাড় নাড়ে, 'ও দুটোই আমার দেখা।'

'তবে তুমি যাও,' দৈত্য আবার তাকায় সমতলের দিকে, 'আমার যাওয়ার উপায় নেই। সে বলেছিল এখানেই ফিরে আসবে। যতদূরেই যাক থাকবে আমায় ছুঁয়ে। তাই আমি সারাদিন তার পথ চেয়ে বসে থাকি।' দৈত্য এবার তাকায় পুটোর দিকে, 'যদি তুমি তাকে খুঁজে এনে দিতে পারো তবে যা চাইবে আমি তোমাকে তাই দেব। কি চাও তুমি পুটো?'

পুটো এখন কত কি চাইতে পারে। দৈত্যের তো সব আছে। রাজার কোষাগারের কত হীরে, জহরত ছড়িয়ে আছে তার গুহার ভেতর।

পুটো বলে, 'আমি কি চাই জানো? দুটো চকমকি পাথর।'

পুটো সারাদিন এইরকম ভাবে। পুটো ঠিক করে এবার সে যাবে দৈত্যের মেয়েকে খুঁজতে। এখন পুটো আর আগের মত

ছোট নেই। এখন সে নদীর ধারে একা একা ঘুরে বেড়ায়। ওই যে নদী নেমে গেছে পাহাড় থেকে নিচে। দখিদাদা বলে যেদিন ছোট্ট ঝরণা পাহাড় থেকে নিচে নেমে নদী হল সেদিন থেকেই হারিয়ে গেল দৈত্যের মেয়ে। পুটো ঠিক করে এই নদীর সঙ্গে ভাব করতে হবে তাকে। ও হয়ত জানে কোথায় গিয়েছে দৈত্যের মেয়ে। ওর কাছে গিয়ে পুটো জেনে নেবে কোথায়, কোন পথ দিয়ে গিয়েছে সেই মেয়ে।

* * *

পরদিন সকালবেলা পুটো শিউলিতলায় গেছে। সঙ্গে সাজি হাতে দখিদাদা। পুটো ফুল তুলবে। হিনি মালা গাঁথবে তা দিয়ে, মার ছবিতে ঝোলাবে বলে।

হঠাৎ তাদের বাগানের ওপাশে তাকিয়ে পুটো অবাক। ঢালু জমিটার নিচে থেকে উঠে আসছে মজারুর সেই গুড়গুড়ে। দখিদাদার চাদরের কোণা ধরে টান মারে পুটো। দখিদাদা ফিরে দেখে গাছতলায় একটা বল নিয়ে লোফালুফি করছে লখাই।

পুটোকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে লখাই, 'তোমার নাম কি খোকা?' একগাল হাসি তার মুখে।

পুটো জবাব দেয়, 'পুটো,' ভাল নাম—'

'থাক ওই ডাকনামেই কাজ চলে যাবে', লখাই হেসে হাত তোলে, 'এই বুঝি তোমাদের বাড়ি?'

পুটো মাথা নাড়ে।

'বাঃ যেন ছবির মত। তুমি মজারু দেখেছ?'

দখিদাদা এগিয়ে এসে বলে, 'আজ বিকালে যাব আমরা সক্কলে।'

'তাই নাকি! বাঃ বেশ,' লখাই হাততালি দেয়। ওর রকম-সকম দেখে হাসি পায় পুটোর। 'আমায় দেখতে পাবে। সুরু থেকেই খেলা আমার। আমি কি কি করি তা এখন বলব না।

তাহলে মজাটাই মাটি হয়ে যাবে। কিন্তু একবার দেখলে তাক লেগে যাবে তোমাদের।'

কথা শেষ করেই একটা ডিগবাজী খেয়ে দু হাতের ওপর ভর করে পা দুটো শূন্যে তুলে দেয়। মুখে হাত চাপা দিয়ে খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে পুটো।

'এখানে কি করছ তুমি ?' আবার যখন সিধে হয়ে দাঁড়ায় লখাই তখন পুটো জিজ্ঞেস করে।

'এই একটু বেড়াই, লোকের সঙ্গে ভাবসাব করি,' জবাব দেয় লখাই, 'এই সকালটাই তো ছুটি আমাদের। দুপুর থেকেই খেলার তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। বিকেলে এসো, কেমন ?'

বিকেলে ওরা সবাই মিলে মজারু যায়। তাঁবুর ভেতর ঢুকে পুটো অবাক ? কত লোক ভেতরে। তার মধ্যে কেউ কেউ আবার ওর চেনা। ওই তো ঝামরু সর্দার, হাতে বর্শা, ওই রেলগাড়ির কুলী রামুদাদা আর বাজিপুরের সেই দাড়িওয়ালা মাঝি। আরও কত লোক।

হঠাৎ ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে খেলা শুরু হয়ে যায়। উঁচু উঁচু দোলনা থেকে লাফ দিয়ে নিচে জালের ওপর পড়ে একের পর এক ছেলেমেয়ে। পুটোর বুক ধড়াস ধড়াস করে। খেলুড়েরা কিন্তু দিব্যি হাসছে।

এর মধ্যে দড়ির মই বেয়ে লখাই কখন ওপরে উঠে পড়েছে। সে-ও দোলনা থেকে লাফ দেবে। মুখে রং, মাথায় টুপি, রংদার কুর্তা-পাজামায় সে যেন এক সং। একটা দোলনায় দুলতে দুলতে সেটা ছেড়ে দিয়ে শূন্যে লাফ দিয়ে আর একটা দোলনা ধরে সে ঠিক পাকা খেলুড়ের মত। পরপর তিনবার এই রকম কসরৎ দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেয় সে সবাইকে। চারবারের বার হাত ফসকে তালগোল পাকিয়ে যেই জালের ওপর পড়ে, অমনি হাসির হররা ওঠে চারদিকে।

এরপর আসে হাতির পাল। পাঁচটা হাতি। মাঝখানের হাতিটার পিঠের ওপর শিবঠাকুরের পট। পটটা মাটিতে বসিয়ে দেওয়ার পর একটা হাতি শুঁড় তুলে ঘণ্টা বাজায় আর একটা হাঁটু গেড়ে বসে গড় করে। আর দুটো শুঁড়ে করে জল ছিটোয় শিবঠাকুরের মাথায়। এবারও হাততালি। দখিদাদা আবার হাতজোড় করে কপালে ঠেকায়।

এমন জমজমাট খেলা পুটো কখনও দেখেনি। যেমন জগুলালের বাঘের খেলা তেমনি লখাইয়ের নাচন কোঁদন। নবীন জিজ্ঞেস করে, 'কেমন দেখলে পুটো?' পুটো জবাব দেয়, 'খুব ভাল বাবা। তবে তিনকড়ি সঙ্গে এলে আরও ভাল হত।' শিউলি গাছটার কাছে এসেছে কি আসেনি ওরা তিনকড়ি ছুটে এসে ভৌ ভৌ করে লাফিয়ে পুটোর কোলে উঠতে চায়। পুটো যত বলে, 'ওরে থাম, থাম,' তিনকড়ি তত লাফায়। শেষে কোলে তুলে আদর করতে তবে শান্ত হয়।

ওদিকে হিনি গিয়ে বসেছে কাঠের খোপের সামনে। খোপের দরজা একটু ফাঁক করে বলে, 'কত কি দেখলুম রে, পাঁচবোন। কতরকম খেলা, কী সুন্দর বাজনা, কত হৈ চৈ। তোরা যদি দেখতিস।' শুনে পাঁচবোন প্যাঁক প্যাঁক করে কি যেন বলে। ওদিকে তিনকড়ি তো লেগে আছে ফেউয়ের মত পুটোর সঙ্গে। বই খাতা নিয়ে চাটাইয়ের ওপর বসে পুটো বলে, 'খেয়ে উঠে তোকে সব বলব'খন। এখন দাঁড়া, আমি পড়া করে নিই। নইলে গুরুমশার বেত খাব কাল। তোর ভাল লাগবে?'

বাংলা পড়া শেষ করে পুটো আঁকের খাতা টেনে নেয়। একটা দুটো অংক কষার পর ফস্ করে একটা মুখ এঁকে ফেলে খাতার কোণে। এটা জগুলালের মুখ। তারপর যে মুখ আঁকে সেটা দৈত্যের। একজন আর একজনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে। পুটোকে এখন আঁকায় পেয়েছে। এরপর তার খাতায়

এসে হাজির হয় ঝামরু।

পুটো ফিক করে হাসে। তিনজনের মধ্যে যদি লড়াই বাধে তবে বেশ মজা হয়।

*　　　　*　　　　*

ওকে? ওই যে বেড়ার ধারে চোখে চশমা, চুলে সিঁথি কাটা বাবু? বয়স হবে সতেরো-আঠারো। পুটো একে আগে কখনও দেখেনি। বাবুর পরনে নীল জামা, সাদা ধুতি, কাঁধে রংচংয়ে ঝোলা একটা। উনি যে শহর থেকে এসেছেন তা পোষাক-আশাকেই টের পাওয়া যায়। এখন রেলগাড়ি হওয়ায় হুটহাট শহুরে মানুষেরা চলে আসে চূড়ামণে।

পুটো গলা নামিয়ে ডাকে, ‘এই দিদি দেখে যা।’ ভাই-বোন ওদের কুঁড়ের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে বেড়ার ধারে নিচু হয়ে কি যেন খোঁজে বাবু। পুটোর এখন সাহস বেড়েছে, সে জিজ্ঞেস করে, ‘আপনি কি কিছু খুঁজছেন?’

ছেলের নাম অমল। সে হেসে বলে, ‘হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। হারিয়েছে একটা তারামাছ। সেটাই খুঁজছি। ঠিক তারার মত গড়ন যদিও সেটা মাছ একটা। সমুদ্রের ধারে পাওয়া যায়। কাল রাতে এখান দিয়ে যাওয়ার সময় পড়ে গেছে কিনা তাই দেখছি।’

শুনে পুটোর চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। সে এক ছুটে চলে যায় বাড়ির ভেতর। ফিরে এসে অমলের সামনে হাতের মুঠো খুলে বলে, ‘দেখুন তো এইটে কি না!’

পুটোর হাতে একটা তারামাছ। অমল খুশি হয়ে বলে, ‘হ্যাঁ এটাই। তুমি কোথা পেলে?’

পুটো মাথা নাড়ে, ‘আমি না দিদি।’ পুটো দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা হিনিকে দেখায়। ‘ও ভোরে ফুল তুলতে গিয়ে দেখে এটা পড়ে আছে ঘাসের ওপর। তুলে এনে রেখে দিয়েছিল ঘরে।’

তারামাছটা হাতে নিয়ে অমল বলে, 'খুব উপকার হল আমার। জানো, এটা আমি কোথা থেকে পেয়েছি? সমুদ্রের ধার থেকে।'

সমুদ্র! শুনেই পুটোর চোখের সামনে নীল জল ছলাৎকরে ওঠে যেন। সমুদ্রের কথা শুনেইছে সে কেবল, পড়েওছে বইতে। এই মানুষটা তাহলে সত্যি সত্যি সমুদ্র দেখেছে!

'তুমি সমুদ্র দেখেছ?' পুটো বড় বড় চোকে তাকিয়ে থাকে অমলের মুখের দিকে।

'শুধু দেখিনি সমুদ্রের ধারে থেকেওছি কতদিন,' অমলের চোখ দুটি যেন স্বপ্ন জড়ানো, 'আমার বাবা তো নাবিক ছিলেন জাহাজের। তাঁর কাছে সমুদ্রের গল্প শুনেছি আমি ছোটবেলা থেকে।' পুটোর কাঁধের ওপর হাত রেখে অমল বলে, 'আমি এইসব নিয়ে একটা বই লিখছি জানো, পুটো। এই শাঁখ, তারামাছ, ঝিনুক; পাতা, শেকড়, ফুল; চাঁদ, তারা আর জোনাকির কথা থাকবে সে বইয়ে।'

পুটো অমলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার এই নতুন বন্ধুটির রুক্ষ চুল আর গভীর চোখ দুটিতে যেন দূরদেশের মায়া। এমন কাউকে এর আগে কখনও দেখেনি পুটো।

'আমি অনেক পাহাড় দেখেছি,' অমল বলে 'অনেক নদী আর জলপ্রপাত।'

পুটোর মনে পড়ে দৈত্যের মেয়ের কথা। সে-ও গিয়েছিল নানা দেশ দেখতে। তারপর ফিরে আসেনি আর। কে জানে অমলবাবু এত দেশ বেড়াতে গিয়ে কোথাও তার দেখা পেয়েছে কিনা।

অমল দাওয়ায় এসে চাটাইয়ের ওপর বসে। হিনি থালায় মুড়ির মোয়া আর ঘটিতে ভরে জল এনে রাখে তার সামনে। রঙীন ঝোলা থেকে অমল বার করে বাঁধানো খাতা একটা। পুটোকে বলে, 'এই দেখো, যত দেশে গিয়েছি আমি সব জায়গার কথা লিখে রেখেছি

এতে। তুমি যখন বড় হবে তখন তো যাবে নতুন নতুন দেশে। তার আগে যদি পড়ে নাও আমার লেখা তবে আগে থেকেই জানতে পারবে সেখানকার কথা।'

পুটো খাতা খুলে পড়ে। নীল কাগজের ওপর কালো কালি দিয়ে ছবির মত লেখা। পড়তে পড়তে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মরুভূমির বালির স্তূপ, কানে বাজে নদীর ছল্‌ছল্‌। পুটো যেন কার হাত ধরে বেরিয়ে পড়েছে নানা দেশ বেড়াতে। পুটো এখন চাইলেই ছুঁতে পারে মেঘ, দেখতে পারে সমুদ্রের অতলে রয়েছে কোন অজানা গাছপালা। বাইরে শিউলি গাছের মাথা থেকে রোদ সরে যায়, চড়ুই শালিকের দল খড়কুটো জুটিয়ে নতুন বাসা বাঁধে আমগাছের ডালে, পাঁচবোন প্যাঁক প্যাঁক করে সাঁতার কাটে পুকুরে, তিনকড়ি চুপ করে শুয়ে আছে পুটোর পায়ের কাছে।

পুটো এসব কিছু দেখে না, শোনে না। সে ভাবে তারও তো কোথায় যাওয়ায় কথা ছিল। অমলের এই খাতাটা যেন নতুন করে মনে করিয়ে দেয় তাকে সে কথা।

* * *

এর মধ্যে লখাইয়ের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে যায় পুটোর। ছেলেটা ভারী আমুদে তার ওপর তার তিনকুলে কেউ নেই তাই নতুন কোন বন্ধু পেলেই তাকে ভীষণভাবে আঁকড়ে ধরে ও।

এক ছুটির দিন সকালে পুটো আর হিনি দখিদাদাকে নিয়ে চড়ুই ভাতি করে। লখাইকেও নেমন্তন্ন করে পুটো। খুব আনন্দ করে ডাল, ভাত, আলুর দম আর জলপাইয়ের টক খায় চার জনে।

খাওয়ার পর আমগাছের নিচে ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে লখাই তার ছোটবেলার কথা বলে যায়। কেমন করে এল সে মজারুতে। কেমন লাগে তার এখানে খেলা দেখাতে। এক দেশ থেকে আর এক দেশে যেতে। এইরকম নানা কথা।

বারো বছর বয়সে মা-বাবাকে হারিয়ে অনাথ হয়ে পড়েছিল লখীন্দর। যখন যেখানে যা কাজ পায় তাই করে। কখনও মাটি কোপায় কখনও হাটে মহাজনের মাল বয়ে নিয়ে যায়। একদিন এক হাটে মাথায় করে কুমড়ো নিয়ে যাচ্ছে লখাই এমন সময় দেখল সে সেখানে মজারুর খেলা বসেছে। কাজ ফেলে টিকিট কেটে ঢুকে পড়ল সে তাঁবুতে। খেলা দেখে তাক লেগে গেল তার। খেলার পর সোজা মজারুর মালিক প্রতাপচাঁদের কাছে গিয়ে বলল সে মজারুতে একটা কাজ চায়।

প্রথমে কুলীর কাজই পেয়েছিল। মজারুর সঙ্গে ঘুরতে লাগল লখাই এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে। খেলার ফাঁকে ফাঁকে খেলুড়েরা যখন বিশ্রাম করত লখাই তখন নানারকম রগড় করে হাসাত তাদের। একদিন খাওয়ার সময় তার ভাঁড়ামি দেখে প্রতাপচাঁদ তো হেসে খুন! সেই থেকে সে হল মজারুর ভাঁড়। সে হয়ে গেল আজ চার বছর। এখন ভাঁড়ামিতে বেশ পোক্ত হয়ে গেছে লখাইচন্দর।

কিন্তু অন্যদের এত হাসালে কি হবে লখাইয়ের জীবনে দুঃখ বড় কম নেই। ওই জগুলাল তাকে বড় জ্বালাতন করে। দিনরাত তার পেছনে লাগে। তাকে ভয় দেখায়, তার মাথার চুল ধরে টানে, তাকে বাঘের খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে হাততালি দেয়। প্রতাপ-চাঁদের কাছে এ নিয়ে নালিশ করেছে লখাই কিন্তু ফল কিছু হয়নি। প্রতাপ সম্পর্কে জগুলালের মামা, তার ওপর বাঘের খেলা দেখায় বলে জগুলালের একটা আলাদা খাতির আছে। তাই লখাইয়ের নালিশ শুনে হুঁ হাঁ করে গেছে প্রতাপ কিন্তু কোন প্রতিকার সে করেনি।

পুটোর শুনে খারাপ লাগে। লখাইয়ের মত একটা ভাল মানুষ, আমুদে ছেলেকে কষ্ট দেয় কেউ কি করে সে বুঝে পায় না। এর কদিন পরে একদিন পাঠশালা যাওয়ার পথে জগুলালের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় পুটোর।

'কি খোঁকাবাবু ? পাঁঠশালা চলেছো?' নাকি সুরে বলে জগুলাল।

পুটো ফিরে দেখে জগুলাল। ইয়া চওড়া বুক তার, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, চোখগুলো বিশাল। সত্যি বাঘকে বশ করতে এরকম চেহারার লোকই দরকার হয়।

'দেখেছ আমার খেলা ?' জিজ্ঞেস করে জগুলাল, 'মজারু গিয়েছিলে তো সেদিন।'

পুটো ঘাড় নাড়ে। জিজ্ঞেস করে, 'লখাই কোথায় ?'

'লখাইয়ের খোঁজ কে রাখে,' মুখ বেঁকিয়ে বলে জগুলাল, 'একটা পুঁচকে ছেলে। যেমন ভীতু, তেমনি আলসে। আবার একটা ধমক দিলেই কেঁদে ফেলে ভ্যাঁক করে।'

নিজের হাতের পেশীগুলো টিপে টিপে দেখে জগুলাল। এই লোকটা ভয় পায় এমন কিছু বোধহয় নেই সংসারে। কিন্তু প্রাণে দয়ামায়াও বড় কম ওর। তাই একটা ছোট ছেলেকে দুঃখ দিতে ওর প্রাণে বাধে না।

পুটো এখন বড় হয়ে গেছে। আগের চেয়ে সাহস বেড়েছে। জগুলালের মুখের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি লখাইকে মারো, তাই না ?'

'তোমায় বলেছে বুঝি ?' জগুলাল হা হা করে হেসে ওঠে, 'নালিশ করেছে, দেখেছ।' হাসি থামিয়ে বলে, 'ওকে ঠিক মারা বলে না। একটু পেছনে লাগি মাত্র। আসলে এতে আমি দারুণ মজা পাই। যে লোকটা ভাঁড়ামি করে লোক হাসায় তাকে কাঁদতে দেখলে আমার খুব মজা লাগে।...ওই তোমার পাঠশালা এসে গেছে, আমি চলি।' আবার ছুটতে শুরু করে জগুলাল চলে যায় চড়াইয়ের মাঠের দিকে।

বিকেলে নদীর ধারে মাঠে পুটোর দেখা হয়ে যায় লখাইয়ের সঙ্গে। নিজের মনে ডিগবাজী খাচ্ছে সে ঘাসের ওপর। পুটোকে দেখে একগাল হেসে বলে, 'এসো, আজ মজারুর খেলা নেই। তাই ছুটি

আমার।’

‘কেন? কেন? খেলা নেই কেন?’

‘একটা হাতি চোট পেয়েছে পায়ে খেলা দেখাতে গিয়ে। সে খেলা দেখাতে পারবে না। বাকি চারজনও খেলা দেখাতে নারাজ। ওদের মধ্যে দারুণ একতা।’

ওরা দুজনে একটা পাথরের টিপির ওপর বসে পাশাপাশি। সূর্য এখন হেলে পড়েছে পশ্চিমে। নদীর তীর ফাঁকা হয়ে এসেছে। পুটো লখাইকে বলে সকালে তার সঙ্গে জগুলালের কি কথা হয়েছিল। লখাই চুপ করে শোনে তারপর বলে, ‘আজ আমায় কি করেছিল ও জানো। হাতির পায়ের কাছে শুইয়ে দিয়েছিল হাত পা বেঁধে। আমি যত চেঁচাই ও তত হাসে। শেষে মুনিয়া এসে হাতিটাকে সরিয়ে নিতে তবে আমি বাঁচি।’

‘মুনিয়া কে?’

‘প্রথম দোলনার খেলা দেখাতে আসে যে ফুটফুটে মেয়েটি তার নামই মুনিয়া। হাতিগুলো খুব বাধ্য ওর। জগুলাল যেমন নিষ্ঠুর ও মেয়েটি তেমনই ভাল।’

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মোছে লখাই। ঘুষি পাকিয়ে বলে, ‘আমিও ওকে দেখে নেব। এমন বিপদে ফেলব যে টেরটি পাবে বাছাধন।’

পুটো ভেবে পায় না লখাই জগুলালকে কি বিপদে ফেলবে। হয়ত মুনিয়াকে বলে হাতির পাল লেলিয়ে দেবে ওর পেছনে। ভয়ের চোটে জগুলাল হয়ত পাহাড়ের ওপরেই ছুটে পালাতে চাইবে তখন। হাতিগুলো তেড়ে যাবে। তার পেছন পেছন।

বেশ মজা হবে তখন। জগুলাল প্রাণের ভয়ে পাহাড়ের ওপর উঠছে, পেছনে শুঁড় তুলে ছুটে আসছে পাঁচটা হাতি। আর খানিকটা ওঠার পরই জগুলাল একেবারে গিয়ে পড়বে দৈত্যের সামনে। তখন?

দৈত্যটা নিশ্চয় সব শুনে ভীষণ বকুনি দেবে জগুলালকে।

পুটো তখন খুশি হবে খুউব।

* * *

'চূড়ামণের মত জায়গা আমি আর দেখিনি,' হাসতে হাসতে অমল বলে, 'এখানে পাহাড় আছে, নদী আছে, আবার আছে বন।'

কথা বলতে বলতে অমল তার ঝোলা থেকে বাঁধানো খাতা ছাড়া আরও একটি জিনিস বার করে। পুটো তার গা ঘেঁষে বসে জিজ্ঞেস করে, 'ওটা কি অমলবাবু?'

'এর নাম দূরবীণ,' অমল বলে, 'এ দিয়ে দূরের জিনিস কাছে দেখা যায়। খুব দামী এটা।'

পুটো সেটা চোখে লাগায়। দেখে সে ভারী অবাক হয়। গাছের পাতাগুলো কি বড় দেখায়। তিনকড়িকে মনে হয় একটা অদ্ভুত জন্তুর মত। পুটোর মুখে কথা সরে না। কত কি জিনিস আছে পৃথিবীতে পুটো তার কিছুই জানে না।

'এটা দিয়ে আমি আকাশ দেখি,' অমল বলে, 'খুব জোরালো দূরবীণ বলেই এ দিয়ে তারাদেরও চিনে নেওয়া যায়।'

হিনি মুড়ি আর শসা এনে দেয়। ওরা দুজনে মিলে যায়। অমল আসার পর থেকে পুটোর বিকেলের খেলা বাদ এখন। সারা দুপুর অমলের পথ চেয়ে বসে থাকে পুটো। কি ভাল লাগে তার কাছে দেশ-বিদেশের গল্প শুনতে। তার খাতা খুলে পাতার পর পাতা লেখা পড়ে যেতে।

'কোথায় থাকছ গো তুমি বাবুমশাই?' সুতোর আসনে নকশা তুলতে তুলতে শুধোয় দখিদাদা।

'ওই শিবঠাকুরের থানে,' জবাব দেয় অমল, 'চাটাই বিছিয়ে শুই ওখানে রাতে, দিনমানে ঘুরে বেড়াই গোটা গাঁ।'

'খাও কোথা?'

'যেদিন যেখানে যা জুটে যায়। অমল হাসে। হাসলে তার মুখটা আরও ভাল দেখায়, 'খুব ভাল লাগে এই নদীতে নাইতে। সাঁতার দেওয়ার পর শরীরটা কি হাল্‌কা হয়ে যায়।'

দখিদাদা নিজের মনে মাথা নাড়ে। ছেলে নয় তো পাখি একটা। উড়ে উড়ে বেড়ায়। দুদিনের জন্যে বাসা তৈরি করে নিয়েছে যেন। কাজ ফুরোলে এ বাসা ছেড়ে চলে যাবে অন্য কোথা!

শিবঠাকুরের থানটা পুটোদের পাঠশালার কাছেই। তার চূড়োয় একটা লোহার ত্রিশূল আছে খুব বড়। দৈত্যটার চোখে পড়েছিল ওই ত্রিশূল। গোটা রাজ্যি তছনছ করে দিলেও ওই ত্রিশূলটা ও নাকি উপড়ে ফেলতে পারেনি কিছুতে। শুনে পুটোর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এত কাছে এসেছিল দৈত্যটা! দখিদাদা তো তাই বলে।

গুম গুম আওয়াজ কানে আসে। পুটো ছুটে ঘরের বাইরে আসে। ওই রেল আসছে, ওই তার ধোঁয়া। ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে উড়ে যায় গড়ের পাহাড়ের দিকে।

এটা বিকেলের গাড়ি। বাতাসপুর থেকে আসছে চূড়ামণের দিকে। নবীন বলেছে আজ সন্ধের আগে ফিরবে অমলের সঙ্গে দেখা করবে বলে। অমলের সঙ্গে আলাপ করার ভারী ইচ্ছে তার।

দুজনে এখন গল্প হয়। অমলই বলে যায় পুটো শোনে একমনে। এই চূড়ামণের বাইরে যে একটা খুব বড় পৃথিবী আছে তা পুটো বুঝতে পারে। সেই বিরাটের অনেকখানি তার চোখের আড়ালে। তবু পুটো যেন অনুভব করে সেই না-দেখা পৃথিবীটা কত বড়।

একটু পরে নবীন আসে। তার পায়ে ধূলো, মাথায় বড় বড় চুলে লেগে আছে খড়ের কুচি। বোধহয় ধান ঝাড়া হচ্ছিল মাঠে। বগলে পটের গোছা, কাঁধের ঝোলা থেকে বড় বড় তুলি বেরিয়ে আছে দেখা যায়।

পুটো ছুটে গিয়ে দু হাতে তার বাবার হাঁটু জড়িয়ে ধরে। 'বাবা, বাবা এই যে অমলবাবু। ওঁর হাতে ওটা কি বলো তো? দূরবীণ। আর ওই খাতায় লেখা আছে নানা দেশের কথা।'

অমলের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে নবীন বলে, 'তোমার কথা খুব শুনেছি ভাই।'

অমল বলে, 'আপনার পট দেখাবেন আমায়?'

নবীন হেসে মাথা নাড়ে। দখিদাদা ঘরের ভেতর থেকে নিয়ে আসে পটের গোছা। অমল এক এক করে দেখে। কোনটা পাহাড়ের ছবি, কোনটা নদীর। কোনটায় দেখা যায় গাছের তলায় বসে বাঁশী বাজাচ্ছে রাখাল ছেলে।

'কী ভাল! অমল অবাক হয়ে দেখে, 'আমি অনেক দেশ ঘুরেছি কিন্তু এমনটা কোথাও দেখিনি। চোখে যা দেখা যায় ছবিতে তা ফুটেছে তারও চেয়ে ভাল।' সে মুখ তুলে তাকায় নবীনের মুখের দিকে, 'আমার এই খাতার লেখা দিয়ে বই হবে। তার মলাট করতে চাই আমি এই পট দিয়ে।' তারায় ভরা আকাশের এক পট বেছে নিয়ে সে বলে, 'দেবেন আপনি আমায় এই পটখানা?'

নবীন খুব খুশি। তার পট ছাপা হয়ে ছবি হবে। সে ছবি র বে লোকের হাতে হাতে। সবাই জানবে চূড়ামণ কত সুন্দর গ্রাম। উৎসাহভরে বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাও তোমার যেটা খুশি।'

হঠাৎ পুটোর দিকে চোখ পড়ে অমলের। পুটো হাঁ করে তাকিয়ে তার মুখের দিকে।

'কি পুটো কিছু বলবে?' অমল পুটোর পিঠে হাত রাখে।

পুটো দৈত্যের কথা বলতে পারে না। যদি অমলবাবু হেসে ওঠে তার কথা শুনে। পুটো বলে, 'তুমি চকমকি পাথর দেখেছ অমলবাবু?'

'হ্যাঁ। যা ঠুকলে আগুন জ্বলে তাই তো?'

পুটো মাথা নাড়ে, 'যদি কোনদিন ওই পাথর পাও আমায়

দেবে এনে ?'

পুটোর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে অমল জবাব দেয়, 'দেব।'

নবীন আর অমল কথা বলে। পুটো চলে যায় জানলার পাশে। পাহাড়টা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। যেন একরাশ অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে। ওর চূড়োর ওপর ঝিকমিক করছে একরাশ তারা। ওই তারাগুলোর কথা কি লেখা রয়েছে অমলবাবুর খাতায় ? ওরা কি জানে দৈত্যের মনে তার মেয়েকে হারিয়ে কত দুখ ?

বাবা অত পট আঁকে তবু দৈত্যকে আঁকে না কেন ? কেন অমলবাবুর খাতায় নেই ওর কথা ? কেন দখিদাদাই শুধু বিশ্বাস করেও রয়েছে এখনও, আর কেউ মানতে চায় না সে কথা ?

আর একটু বড় হলেই পুটো যাবে দৈত্যের মেয়েকে খুঁজতে। এই দূরবীণটা যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে তবে তার কাজটা সহজ হয়ে যাবে।

যদি এটা না-ও থাকে তবুও পুটো যাবে।

* * *

ওদিকে ঝামরু বাঘ খুঁজে ফেরে। তিনমাস হয়ে গেল এখনও পর্যন্ত বাঘের দেখা না পেয়ে ঝামরুর নিজের দশা যেন খ্যাপা বাঘের মত। মাথার চুল জট ধরেছে তার, জং ধরেছে বর্শার ফলায়। তবু ঝামরুর চোখ জ্বলে। এই অবস্থায় কোনদিন বাড়ি ফিরলে তার মা বলে, 'ওরে আর যাস নে। এবার তুই কোনদিন বাঘের পেটে যাবি।' ঝামরু শুনে হাসে। মায়ের মানা শোনে না। ঘোরে এ বন থেকে সে বন। বুড়ি মা ছেলের পথ চেয়ে বসে থাকে তার মাটির ঘরে।

ঝামরু বনে বাঘ খোঁজে আর অমল খুঁজে ফেরে একটি অচিন তারা। এই অজানা তারার কথা সে বইতে পড়েছে কিন্তু তার দেখা পায় নি এখনও। তার বইয়ের শেষ পাতায় থাকবে এই তারাটির

কথা। যতক্ষণ না তার দেখা পাচ্ছে ততক্ষণ বই লেখা শেষ হচ্ছে না তার।

তার সঙ্গে পুটের এখন খুব ভাব। সে রোজ বিকেলে আসে পুটোকে পড়া দেখিয়ে দিতে। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে চলে গল্প। অমলের বাবা ছিলেন এক জাহাজের নাবিক। দূর সমুদ্রে গিয়েছিলেন তিনি জাহাজ নিয়ে। সেখান থেকে আর ফেরা হয়নি তাঁর। জাহাজ ডুবি হওয়ার পর একজন নাবিক কি ভাবে ফিরে এসে অমলকে দিয়েছিল তার বাবার এই দূরবীণ। সেটা চোখে লাগিয়ে অমলের মনে হয়েছিল বাবাকে হা।রয়ে পৃথিবীর দূরের বহু জিনিস তার চোখের কাছে এসে গিয়েছে।

অমল পায়েস খেতে ভালবাসে। তাই আজ বিকেলে পায়েস হয়েছে পুটোদের বাড়ি। ঘন দুধ আর সরু চাল দিয়ে। খেতে বসে নবীন বলে, 'হিনি খুব ভাল পায়েস করতে পারে।' হাত চাটতে চাটতে পুটো বলে, 'আমিও পারি।' দখিদাদা বলে, 'তা ঠিক। খোকাবাবা পায়েস খুব খেতে পারে।' সবাই হেসে ওঠে শুনে।

অমলের বইয়ের মলাট হবে যে পট দিয়ে নবীন তাতে নতুন রং চড়িয়েছে। গাঢ় নীল আকাশে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে একটি রূপোলী তারা। অমল এখনও এই তারাটির খোঁজ পায়নি। কোন মেঘের কোলে তার ঠিকানা কে জানে! সূর্য অস্ত যাওয়ার পর চোখে দূরবীণ লাগিয়ে অমল আকাশ দেখে। দিনের পর দিন জাগে তবু সে তারা ধরা দেয় না অমলের চোখে।

পুটো এখন নদীর ধার দিয়ে অনেকটা দূর এগিয়ে যায়। মেয়েরা কলসী ভরে জল নিতে এসে দেখে পাড় দিয়ে হেঁটে চলেছে ছোট একটি ছেলে। তার মাথায় বড় বড় চুল, ভাসা ভাসা চোখ। ঠাহর করে দেখে চিনতে পারে তারা। ও তো নবীন পোটোর ছেলে। একজন বৌ ডাক দিয়ে বলে, 'ও পুটো কোথা যাস? তোর পাঠশালা

নেই ?' ফিরে দাঁড়িয়ে পুটো জবাব দেয়, 'না। গুরুমশাই ভিন গাঁয়ে গিয়েছেন তাঁর মেয়েকে দেখে আসতে। তাই পাঠশালা ছুটি আজ।' পুটো কোথা যেতে চায় তা বলে না। কেননা, এরা হয়ত বিশ্বাসই করে না পাহাড়ের দৈত্যের কোন মেয়ে আছে বলে। নদীর ধারে কোথাও কাশবন, কোথাও বা কাঁটাঝোপ। কোথাও মাঝিদের নৌকো বাঁধা থাকে, কোথাও বা জেলেরা মাছ ধরে জাল ফেলে। পুটো এগিয়ে যায় আর দেখে বক জলে নেমে মাছ ধরে, টিয়ার ঝাঁক ওড়াওড়ি করে। পুটো এখন অনেক দূরে চলে এসেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে হিনি ডাকে, 'পুটো-ও-ও!' পুটো পেছন ফেরে। দরজার সামনে হিনিদিদি দাঁড়িয়ে। তিনকড়ি ডাকে ভৌ ভৌ। পুটো এখন বাড়ির দিকে ছুট লাগায়। ঘাটের মেয়েরা হেসে বলে, 'পোটোর ছেলেটা যেন কেমনধারা। এই এদিকে এল আবার এখন ছুটছে বাড়ির দিকে।'

'দৈত্যকে কি আপনি বলতে হয়, দখিদাদা ?' ছবিতে রং লাগাতে লাগাতে জিজ্ঞেস করে পুটো একদিন। এখন নবীন ছেলেকে অনেকগুলো তুলি দিয়েছে ছবি আঁকার জন্যে।

বেতের ঝুড়ি বানাতে বানাতে হাসে দখিদাদা। পড়া থামিয়ে হিনি বলে, 'তুই তার সামনে মুখই খুলতে পারবি না তার আপনি আর তুমি।'

'মোটেই না,' পুটো জবাব দেয়, 'যেদিন পাহাড়ে যাব দেখিস সেদিন ভয় পাব না এতটুকু।'

শুনে দখিদাদার বুক ধড়াস করে ওঠে। তবে কি ছেলে সত্যি সত্যি যাবে পাহাড়ে ? ক'মাস ধরেই ওর উড়ু উড়ু ভাব। থেকে থেকে কোথা চলে যায় জানতে পারে না কেউ। এর আগে যে ক'জন ডাকাবুকো গিয়েছিল পাহাড়ে তারা কেউ ফিরে আসেনি তা কি ও জানে ?

পুটো এখন কেবল ভাবে দৈত্য আর রেলগাড়ির কথা। ওদের

মধ্যে কে বড় ! নবীনকে শুধোয়,' 'বাবা, এই যে রেলগাড়ি এল এবার কি দৈত্য চলে যাবে ?' শুনে নবীন হেসে জবাব দেয়, 'তোর যেমন কথা ! যে নেই তার আবার চলে যাওয়া কিসের !' শুনে দখিদাদা ভুরু কুঁচকোয়। গুটি গুটি পুটোর পাশে গিয়ে বুড়ো বলে, 'ওকি রেলকে ভয় পায় নাকি ? অমন দশটা রেলগাড়ি ও উল্টে ফেলে দিতে পারে। ও চুপচাপ থাকে ওর মন ভাল নেই বলে। যতদিন না মেয়ে ফিরে আসে ততদিন ও থাকবে এইভাবে।'

'এসব গপ্পো, দখুদা', নবীন পোটো পুটোর বাংলা খাতা থেকে মুখ তুলে বলে। 'কতকাল ধরে তোমার মুখে শুনছি গড়ের পাহাড়ের ওপর দৈত্য আছে, দৈত্য আছে। কই এতদিনে কেউ তো দেখা পেল না তার।'

'দেখবে কি করে,' বিড় বিড় করে বলে দখিদাদা, 'তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কেউ কি বেঁচে থাকে। পুরণো দিনের কথা তো আর জানো না। কত ভিনদেশী পথিক পাহাড়ের ওপর কি আছে সেই যে দেখতে গেছে তারা আর ফিরে আসেনি কেউ।'

দখিদাদার মুখ দেখে মায়া হয় পুটোর। মনে হয় দখিদাদা একদিকে বাকি সবাই আর একদিকে। এরা সবাই ভাবে পাহাড়ের ওপর কোন দৈত্য নেই, নেই তার মেয়ে। শুধু এই বুড়ো মানুষটাই বিশ্বাস করে সে কথা। ওর এই বিশ্বাসটা যদি কেউ কোনদিন মিথ্যে প্রমাণ করে দেয় তবে মন খারাপ হবে পুটোর সবচেয়ে বেশী।

পুটো এখন রোজ নদীর কাছে যায়। নদী তো কথা বলে না। কুলকুল করে। পুটো চুপ করে বসে থাকে তার পাড়ে। পাঠশালা থেকে ফিরে এসে দুধভাত খায় না, খেলে না গৌরাদের সঙ্গে। তার ভাল লাগে এখন নদীকে দেখতে। মেঘের ছায়া দোলে নদীর জলে, বকেরা সার বেঁধে উড়ে যায় তার এপার থেকে ওপারে। পুটোর কানে আসে টি টি পাখির ডাক। পুটো যেন আশা করে থাকে নদী তাকে কিছু বলবে। অমলবাবু বলে প্রকৃতির মত মানুষের আর বন্ধু

নেই। পুটোকে যেতে হবে এই নদী যেখানে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে সেইখানে। অমলবাবুর কাছে দূরবীণটা চেয়ে নেবে সে। সেটা চোখে লাগিয়ে দেখা যাবে নদী কতদূর গেছে। হয়ত নদীর যেখানে শেষ সেখানেই দেখা পাওয়া যাবে দৈত্যের মেয়ের। দখিদাদার মুখে শুনেছে পুটো সেই মেয়েটি চেয়েছিল সমুদ্র কেমন দেখে আসতে।

* * *

লখাই আসে লাফাতে লাফাতে। মুখে হাসি উপচে পড়ছে তার। তিড়িং বিড়িং লাফায় আর বলে, 'আজ কি আনন্দের দিন। তা ধিন, তা ধিন।'

পুটো চৌকিতে বসে বাংলা পড়া করছিল। আজ পাঠশালা ছুটি। রিদয় গুরুমশাই এখনও ফেরেন নি মেয়ের বাড়ি থেকে। জিজ্ঞেস করল, 'এত ফুর্তি কিসের গো?'

'খুব জব্দ করেছি জগুলালকে। ভূতের ভয় দেখিয়ে কাবু করেছি বাছাধনকে। হুঁ হুঁ বাবা, আমার সঙ্গে চালাকি।'

'কি রকম? কি রকম?' পুটো বইপত্র সরিয়ে রাখে।

'আমি জানতুম ওর ভীষণ ভূতের ভয়। ছোটবেলায় ঠাকুমা ওকে, 'এই বেম্ভোদত্যি আসছে' বলে কতদিন ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে ও নিজেই বলেছে আমায় সে কথা। তা পরশুদিন আমি করেছি কি একটা শাদা চাদর গায়ে মাথায় জড়িয়ে বসে রইলুম তোমাদের ওই শিরীষ গাছের মগডালে। রোজ রাতে খেলা দেখানোর পর ও লোচনদাসের দোকানে যায় সিদ্ধি খেতে। সেদিন অন্ধকারে যখন ও টলতে টলতে ফিরছে আমি তখন গাছের ওপর থেকে খোলা গলায় বলেছি, 'কেঁ রেঁ কেঁ রেঁ কেঁ রেঁ। ধঁরব নাঁকি তেঁড়ে।' বাস বীরপুরুষ অমনি হাত পা ছরকুটে মাটিতে পড়ল গোঁ গোঁ করতে করতে।'

তারপর থেকে জগুলাল যেন অন্য মানুষ। সেদিন তাঁবুতে

ফিরছে না দেখে মজারুর লোকেরা ওকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। এখন সকালে আর মাঠে দৌড়ায় না জগুলাল। হাঁই হাঁই করে মুগুর ভাঁজে না। তার ভয়ের কারণ শুনে অবাক হয়ে প্রতাপচাঁদ বলেছে, 'বাঘের খেলা দেখাও তুমি, তোমার কিনা ভূতের ভয়, ছোঃ!'

এর চারদিন পরে জগুলাল আজই প্রথম বেরিয়েছে পথে। পাঠশালা যাওয়ার পথে পুটো দেখে বাদাম গাছটার গুঁড়ির ওপর বসে আছে সে চুপচাপ। পুটোকে দেখে শুকনো মুখে বলে, 'তোমাদের গাঁ-টা ভাল নয়, পুটোবাবু। এখানে বড় ভূতের উৎপাত।'

পুটোর খুব হাসি পায়। ভাবে সত্যি কথাটা জানিয়ে দেবে নাকি জগুলালকে? না থাক, তাহলে হয়ত লখাইয়ের ওপর খুব রেগে যাবে ও। পুটো খুব খুশি হবে যদি এই দুজনের ভাব হয়ে যায় বরাবরের মত।

সেদিন পাঠশালা থেকে বাড়ি ফিরতে দখিদাদা বলে, 'খবর শুনেছ খোকাবাবা?'

সরল চোখদুটি তুলে পুটো জিজ্ঞেস করে, 'কি?'

'ঝামরু বাঘের দেখা পেয়েছে গো।'

'সত্যি!' পুটোর বুকে গুরগুর করে ওঠে।

'হ্যাঁ রে, ওর গাঁয়ের একজন আজ এসেছিল কুশপুরের হাটে মধু বেচতে। তার কাছেই খবর পেলুম। মেঘাসোনির বনের একেবারে শেষে সেখানে কালো হলুদের ডোরা দেখতে পেয়েছে ঝামরু।'

পুটো যেন দেখতে পায় ঝামরু ছুটেছে বর্শা হাতে, মুখে তার হারে রে রে ডাক। সারা মেঘাসোনি জুড়ে এখন ডুম ডুম ঢোলের বাদ্যি কানে আসে তার। পুটোর বুক ঢিপ ঢিপ করে। সে পরীর কথা ভাবে।

* * *

আজ বিকেলের আলো থাকতে থাকতেই ঘরে ফিরেছে নবীন!

দুয়োরে পা দিয়েই হাঁক দিয়েছে, 'কোথা গেলে অ পুটো, অ হিনি, কোথা গেলে গো দখুদাদা।'

ভাই বোন খেলা ফেলে ছুটে আসে। দখিদাদা একটা পাখির খাঁচা তৈরি করছিল বাড়ির পেছনে গাছতলায় বসে। ডাক শুনে ছুটে আসে সে-ও তাড়াতাড়ি।

নবীন তার ঝোলা থেকে আতা বার করে। এক একটা ফল তুলে দেয় হিনি, পুটো আর দখিদাদার হাতে বলে, 'খাও সবাই। বাতাসপুরের আতার ভারী নাম জানো তো। একজন চাষী দিল আমায়। ওহ্, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। এতদিন ধরে যা চেয়েছিলুম আজ পেয়েছি তা।'

'কি হয়েছে বাবা, কি হয়েছে?' আতায় কামড় দিয়ে শুধোয় হিনি, পুটো।

এক অদ্ভুত গল্প শোনায় নবীন পোটো। এতদিন ধরে সে পট আঁকছে কিন্তু ঠিক সূর্যের কিরণ, কাশফুল কি সোনালী ধানের রং হুবহু ফোটাতে পারেনি পটে। এই নিয়ে বড় দুঃখ ছিল তার মনে। যা দেখে, দেখে পট আঁকে তার কাছে নিজের মেলানো রং বড় ফিকে লাগে। আজ বাতাসপুর পৌঁছে মাঠভরা পাকা ধান দেখে সে ছবি আঁকতে লোভ হয়েছিল। আঁকা শেষ হতে পটখানি পাথরের ওপর রেখে দিয়েছিল রং শুকোতে। তারপর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল পাখির কিচিরমিচির শুনে। তার আঁকা পট সত্যি ভেবে চড়ুই আর শালিকেরা তার ওপর বসে ঠুকরে দেখছে।

নবীন হাসল, 'আমি উঠে বসতে পাখির দল উড়ে গেল কিন্তু আমার মনকে ভরিয়ে দিয়ে গেল তারা আনন্দে। মনে হল এতদিনের পট আঁকা ধন্য হল আমার।'

সেদিন পুটোদের বাড়ি আনন্দের ধুম পড়ে যায়। আর পটুয়া যাবে না ভিন গাঁয়ে পট আঁকতে। এখন থেকে বাড়িতেই করবে

সে আঁকার কাজ। তাতে হিনি পুটোর খুব আনন্দ। রাতে আজ ভাল খাওয়া-দাওয়া হবে। হবে খিচুড়ি, তিলের বড়া আর সরু চালের পায়েস। রাঁধবে দখিদাদা। নবীন বলে, 'যা পুটো অমলকে ডেকে নিয়ে আয়। ওকে বলবি আজ আমাদের সঙ্গে খাবে।'

কিন্তু না, শিবঠাকুরের থানে কেউ নেই। একটা গোল করে গোটানো চাটাই শুধু পড়ে আছে। কোথায় ঘুরছে অমল কে জানে। বাড়ী ফিরে আসে হিনি, পুটো। ওরা কিছু বলবার আগেই তিনকড়ি ভৌ ভৌ করে উঠে নবীনকে জানিয়ে দেয় যে যার জন্যে গিয়েছিল তারা সে নেই সেখানে।

আকাশে যখন গোল হয়ে চাঁদ ওঠে তখন ওরা খেতে বসে। আকাশ এখন পরীর ওড়নার মত ফুরফুরে। কি ভাল রান্না করেছে দখিদাদা। বুড়োর যেন গুণের শেষ নেই। পুটো, হিনি ভারী খুশি। কাল থেকে বাবা আর বাতাসপুর যাবে না। যেন অনেকদিন বিদেশে চাকরি করার পর বাড়ি ফিরে এসেছে বাব,—এমনি মজা লাগছে তাদের।

* * *

'আরে, একি তোমরা!'

জগুলাল আর লখাইকে চড়াইয়ের মাঠের দিক থেকে আসতে দেখে অবাক হয় পুটো! দুজনেরই মুখে হাসি। জগুলাল আবার একটা চৌকো মত বাঁশী মুখে দিয়ে বাজাচ্ছে। আর মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে দিচ্ছে তাল। ওদের পেছন পেছন আসছে চূড়ামণের একপাল ছেলে।

'আমাদের ভাব হয়ে গেছে জানো তো পুটো,' লখাই বলে একগাল হেসে, 'অনেক কথা জমা হয়ে আছে তাই আমরা একটু আলাদা হয়ে ঘুরছি।'

'ঝগড়া আমিই করতুম, জগুলাল বলে,' লোকে আমায় ভয়

করলে আমি বেজায় খুশি হতুম। ক'দিন আগে নিজে ভয় পেয়ে বুঝেছি ভয় পেতে কি খারাপ লাগে।...জানো তো, 'এই লখাইটাই ভূত সেজে আমায় ভয় দেখিয়ে বোকা বানাত।' গলা ছেড়ে হা হা করে হেসে ওঠে জগুলাল, 'কি দুষ্টু ভাবো।'

লখাইও হাসে। হাসতে হাসতে বলে, 'আমি নিজেই ওকে সব বলে দিয়েছি, পুটো ভাই। ও মুখ গোঁজ করে বসে থাকত, আমার ভাল লাগত না মোটেও। ভূত সাজতেও ভারী বিশ্রী লাগত আমার।'

'আজ আমাদের শেষ খেলা এখানে,' জগুলাল বলে, 'তাই আমরা বাঁশী বাজাতে বাজাতে গোটা চুড়ামণ চক্কর দিচ্ছি। কাল মজারুর তাঁবু উঠে যাচ্ছে চুড়ামণ থেকে। যাওয়ার আগে তাই বলতে এলুম তোমায়। চূড়ামণের এত লোকের মধ্যে তোমার সঙ্গেই আমাদের ভাব হয়েছিল বেশী।'

পুটোর বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে। মজারু এখান থেকে চলে যাবে এ যেন ভাবতে পারে না সে।

ওরা বাঁশী বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যায়! পুটো দাঁড়িয়ে থাকে। নিচু পথটা ধরে ওরা পাঠশালার ঘরের ধার দিয়ে চলে যায় কুলতলীর দিকে। জগুলাল বাঁশী বাজায়, লখাই তালে তালে নাচে। আস্তে আস্তে আবছা হয়ে আসে ওরা পুটোর চোখের সামনে।

* * *

সাতসকালে ছুটতে ছুটতে আসে অমল।

ছোটে আর বলে, 'পেয়েছি, পেয়েছি! অচিন তারার দেখা আমি পেয়েছি!' পুটো, পুটো, 'তুমি কোথায়!'

হিনি, পুটো অবাক হয়ে এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। নবীন পোটো আর দখিদাদা ছুটে এসেছে তাদের হাতের কাজ ফেলে।

'কাল রাতে সেই তারার দেখা পেয়েছি,' বাড়ির সামনে এসে

হাঁপাতে হাঁপাতে বলে অমল, ওহ্., 'আজকের দিনটা কি ভাল।'

'কোথায়? কেমন করে?' অমলের কাঁধের ওপর হাত রেখে শুধোয় নবীন পটুয়া।

'ঠিক শিবঠাকুরের ত্রিশূল আকাশের যে জায়গাটিকে বিঁধতে চায়, ঠিক সেই খানটিতে জ্বলজ্বল করছিল সেই তারা। আমি তাকে সারা আকাশ খুঁজেছি! নদীর ধারে, পাহাড়ের টিলায়, বনের শেষে, কত জায়গায় তার দেখা পেতে গিয়েছি। কিন্তু সে যে আমার এত কাছে ফুটে রয়েছে তা কোনদিন খেয়াল করিনি। পুঁথি খুলে, অংক কষে মিলিয়ে দেখেছি—এ সে-ই তারা।

চারজনে তাকিয়ে থাকে অমলের মুখের দিকে। তাকে এত খুশি কেউ কোনদিন দেখেনি। বাতাসপুরে ধানের শীষের পট এঁকে যে নবীন যেদিন ফিরে এসেছিল সেদিন তারও মুখে ঝল্‌মল্‌ করছিল এমনই আনন্দ।

'তুমি ঠিকই বলেছ,' নবীন বলে মাথা নেড়ে, 'ঘরের দোর-গোড়ার ঘাসফুল আমাদের নজর এড়িয়ে যায়, আমরা দূরদেশের গোলাপ বাগান দেখতে ছুটি।'

পুটো ভাবে এবার তবে অমলবাবু চলে যাবে। শহরে ছাপা হবে তার বই। হয়ত অমলবাবু তাদের ভুলে যাবে।

'কি পুটো, খুশি তো?' অমল পুটোর হাত ধরে।

পুটোর মন ভাল নয়। তবু সে হাসে অমলের মুখের দিকে তাকিয়ে।

'আমি আমার বইয়ে লিখব তোমার কথা। চূড়ামণের আকাশে বাতাসে যে মায়া তোমার চোখেও তাই। তোমায় আমি ভুলতে পারব না।'

পুটো ভাবে, এতদিন ধরে ভাব অমলবাবুর সঙ্গে, তবু কত কথা বলা হয়নি। বলা হয়নি দৈত্যের কথা বা তার হারানো মেয়ের কথা। পুটো যখন পাবে দৈত্যের হারানো মেয়ের খোঁজ তখন শহরে

গিয়ে অমলবাবুকে জানিয়ে আসবে তা।

'এবার তো আমি চলে যাব পুটো।' ঝোলা থেকে দূরবীণটা বার করে অমল বলে, 'যাওয়ার আগে তোমাকে দিয়ে যেতে চাই এটা। তোমার এখনও অনেক কিছু দেখা বাকি আছে। এটা তোমার কাজে লাগবে। তুমি আমার কাছে চকমকি পাথর চেয়েছিলে আমি তা এনে দিতে পারিনি। হয়ত এটা দিয়ে তুমি তার চেয়ে দামী কিছু খুঁজে পাবে। এটা তুমি নাও।'

অমল চলে যাওয়ার পর পুটো দাঁড়িয়ে থাকে পথের বাঁকে। চোখের আড়াল হয়ে যাওয়ার আগে অমল দূর থেকে হাত নাড়ে। পুটোর মনে হয় অমল যেন বলে, 'তোমাকে ডাকছে অনেক নতুন দেশ। তুমি যাও পুটো, তুমি যাও।'

* * *

এর ক'দিন পরেই চূড়ামনের আকাশ ছেয়ে যায়ে কালো মেঘে। সকাল থেকে শুরু হয় ঝড়। মেঘের কোলে তরোয়ালের ঝিলিকের মত ঝলসে ওঠে বিদ্যুৎ। যেন প্রলয়ের আভাস দিয়ে কড় কড় করে হাঁক দিয়ে ওঠে বাজ।

সবাই তাকায় কালো পাহাড়টার দিকে। ঠিক এমনি সময় ফিরে আসে ঝামরু। কতদিন বনে জঙ্গলে ঘোরার পর আজ সে এসেছে মানুষজনের মাঝখানে।

পুটো পাঠশালা থেকে ফিরে বইখাতা ঘরে রেখে ছুটে যায় চড়াইয়ের মাঠের দিকে। ওখানে এখন মজারুর তাঁবু নেই। ফাঁকা মাঠের মধ্যে ঝামরু দাঁড়িয়ে আছে একা একটা তালগাছের মত।

যে ঝামরু আগে কত হরিণ আর ভালুক মেরেছে, বিষধর সাপের ফণা ধরেছে নিজের হাতের মুঠোয়, সে বলেছে সে আর শিকার করবে না। শুনে পুটো অবাক। সেই মেঘাসোনির বনে বাঘকে তাক

করে বর্শা ছুঁড়েছিল সে, তারপরই নাকি দেখেছে সেই পরীকে। দখিদাদা বলে একবার যে সেই পরীর মুখ দেখেছে সে নাকি আর কোনদিন কারুর দিকে তীর কি বর্শা ছুঁড়তে পারে না। হিংসে ভুলে যায় সে বরাবরের মত।

ওদিকে ঝড় ভয়ংকর আওয়াজ করে আছড়ে পড়ছে চূড়ামণের ওপর। গাছ দুলছে ভীষণভাবে। কোথায় যেন বাজ পড়ল। নদীর জল উঠল ফুঁসে, পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ল এক বিশাল পাথর। অনেকদিন আগে এক দৈত্য যেমন এই রাজ্য ছারখার করে দিয়েছিল, মনে হয় তেমনি আজও কোন ভয়ংকর ওই সুন্দর চূড়ামণকে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে। দখিদাদা আঙুল তুলে বলে, 'এ সেই, সে-ই খেপেছে আজ। আর রক্ষে নেই।' চূড়ামণের মানুষ ভয় পেয়েছে, তারা ভেবেছে দৈত্য তাদের গ্রাম ধ্বংস করতে চায়। পাঠশালা থেকে আসতে আসতেই পুটো দেখেছিল পথে পথে লোকের জটলা। এখন বাড়ির কাছে এসে দেখতে পায় গোটা চূড়ামণের লোক চলেছে ওই পাহাড়ের দিকে। তাদের কারুর হাতে লাঠি, কেউ নিয়েছে বর্শা। দখিদাদা যত বলে, 'যেও না, যেও না, ওখানে ঘোর বিপদ, ওরা তত মরীয়া হয়ে এগিয়ে যায়। ভীড়ের মধ্যে কে যেন বুড়ো মানুষটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয় একধারে।'

পুটো এসে দাঁড়ায় ঝামরুর সামনে। বলে, 'তুমি ওদের ঠেকাও সর্দার। সে-ও তো দুঃখী তার মেয়েকে হারিয়ে। তার তো আর কেউ নেই। তুমি বোঝাও।'

ঝামরুর চুলে জট, গালে বড় বড় দাড়ি। বর্শা ছাড়া তাকে দেখায় এক বাউলের মত। সে বলে, 'ওরা আমার কথা শুনবে না পুটো। আমি যখন বাঘ মারব বলে পণ করেছিলুম তখনও গিয়েছিলুম এমনি ক্ষেপে। আমার মায়ের বারণ শুনিনি।'

'তবে এসো, তুমি আর আমি যাই,' পুটো খুব সহজভাবে বলে।

'তুমি কোথায় যাবে?' ঝামরু অবাক হয়ে বলে। সেই পোটোর

ছেলেটা আজ এমনভাবে কথা বলছে যেন কত বড় হয়ে গেছে।

'আমি যাব অনেক দূর। ওই যে দৈত্যটা কাঁদে আমি শুনতে পাই। নদী যে হাসে তা-ও শুনি আমি। আমি যাব দৈত্যের মেয়েকে খুঁজে আনতে। তাহলে ও শান্ত হবে। যাবে তুমি ?'

ঝামরু হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে দেখে পাহাড়ের চূড়ো। বলে, 'সে মেয়েকে কি আর পাওয়া যাবে? সেই কতদিন আগে হারিয়ে গেছে শুনি……মিছে কেন যাবে।'

পুটো মাথা নেড়ে বলে, 'খুঁজে দেখব তবু। আমায় অমলবাবু বলেছে খুঁজলে পরে অনেক জিনিস মেলে। আমি যাব।'

পুটো এগিয়ে যায়। এইরকম ভাবে যাওয়ার জন্যে কতদিন ধরে তৈরি হচ্ছিল সে মনে মনে। পুটো হাঁটে নদীর ধার দিয়ে। দূর থেকে মানুষের হাঁক ভেসে আসে তার কানে। দূর থেকে এখন ঝামরুকে দেখায় একটা গাছের মত। যত এগিয়ে যায় তত যেন সাহসে ভর করতে পারে সে।

নদী সোজা যেতে যেতে ডাইনে বেঁকেছে। ফের একটা টিলার পাশ দিয়ে যেন খেলার ছলে ঘুরেছে বাঁ দিকে। কোথাও সরু তার ধারা কোথাও গভীর। চড়াইয়ে তার ধীর গতি, উৎরাইয়ে সে নামে গর্জন করে। কোথাও সবুজ শস্যে ভরা মাঠ, কোথাও ধূ ধূ করে বালি। পুটো হাঁটে আর দেখে। যেন নদীই তার হাত ধরে নিয়ে চলে যেখানে সে যেতে চায়।

বেলা বাড়ে। সূর্য এখন মাথার ওপর। ঘূর্ণী হাওয়ায় পাতা ওড়ে, নদীর জল ছল্ ছল্ করে। পুটোর কপাল বেয়ে টপটপ করে ঝরে ঘামের ফোঁটা। পুটো তবু থামে না। কাঠের বোঝা মাথায় এক বুড়ো তাকে বলে, 'কোথায় চলেছ তুমি ভাই, ওদিকে যে পথ আর নাই।' পুটো তার কথা শুনেও শোনে না। পুটো নদীকে দেখিয়ে দেয়। বুড়ো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। পুটো নদীর কিনারে হাঁটে। টিপিটার ওপর উঠে সে দেখে দূর থেকে

দূরে নদী বয়ে গেছে পাক খেয়ে। তার পাড়ে বালি চিকচিক করে। ওপরে ওড়ে পাখির ঝাঁক।

সূর্য এখন ঢলে পড়েছে আকাশের কোলে। পুটো শুনতে পায় দূরে কোথাও ঘণ্টা বাজে। হয়ত আরতি শুরু হয় কোন মন্দিরে। এখন পুটো এতদূরে এসেছে যে হিনি কি দখিদাদার গলাও সে শুনতে পায় না। এখান থেকে চূড়ামণ ঝাপসা দেখায়। শুধু স্পষ্ট দেখা যায় শিবঠাকুরের ত্রিশূল। ওই ত্রিশূলের ডগার কাছে ঝিকমিক করছে ওই বুঝি সেই তারা যার কথা অমলবাবু লিখেছে তার বইয়ে।

হঠাৎ পুটো থমকে দাঁড়ায়। পুটো নদীর কাছে আসে। পুটো আঁজলা করে জল নিয়ে চোখেমুখে দেয়। জলের ওপর দিনের শেষ কিরণটুকু পড়তে রূপোর হার ঝিলিক দিয়ে ওঠে যেন। পুটো ফিস ফিস করে বলে, 'তুমি জানো, তুমি জানো সে কোথায়।'

নদী কুলকুল করে। পুটো কান পেতে শোনে। এতদিন নদীর ঢেউ শুধু ছল্ ছল্ করত আজ মনে হল তারা যেন প্রথম কথা কইছে। বলছে, 'আমিই তো সেই। তুমি জানো না? আর কেউ এমন করে খোঁজে নি। তোমাকে বলি, পাহাড় থেকে নেমে এসেছি তো আমিই। আমার প্রথম চোখ মেলে চাওয়া তো তারই কোলে। তারপর সেখান থেকে নেমে চলে গিয়েছি কতদূর। তবু আমার জন্ম যেখানে সেখানে তো রয়েছি আমি আজও। গাছের যেমন শেকড় থাকে মাটিতে, ফুলের প্রাণ তার বোঁটায়, তেমনি আমার প্রথম সকাল দেখা ওই পাহাড়ের বুকে।'

পুটো এখন ছোটে। নদীর কথা শুনেছে পুটো, এখন যেতে হবে তাকে পাহাড়ে। পুটো বুঝেছে নদীই হল পাহাড়ের মেয়ে। ছোট মেয়ের মতই চঞ্চল গতিতে নেমে এসেছে পাহাড়ের ওপর থেকে। পুটো ঝড়ের বেগে ছোটে। হাওয়ায় ওড়ে তার কোঁকড়া কালো চুল, গাছের কাঁটায় তার পরণের ধুতি যায় ছিঁড়ে, তবু তার মুখে খুশি

ঝল্‌মল্ করে। অমলের মত আনন্দ তার মনে এখন, ঝামরুর সাহস তার বুকে। পুটো এখন রূপকথার রাজপুত্রের মত এক দেশ থেকে ছুটে যেতে পারে আর এক দেশে।

ওই দক্ষিণে তাদের বাড়ি, ওই পূবের জানালা। আর উত্তরে ওই পাহাড়। পাহাড়টার এত কাছে পুটো আসেনি কখনও। কী উঁচু উঁচু পাথর, মনে হয় পৃথিবী যেন মরীয়া হয়ে ছুঁতে চাইছে নীল আকাশের বুকের ভেতরটা। ওই পাহাড়ের কোন গুহাতেই থাকে সে-ই দৈত্য, দখিদাদা বলে।

'শোন, শোন, আমি পুটো,' পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়োটার দিকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে ওঠে পুটো, 'আমি পেয়েছি তোমার মেয়ের খোঁজ! যে হারিয়ে গেছে বলে তোমার মনে এত দুঃখ সে তো রয়েছে তোমারই মধ্যে।' পুটো আঁজলা করে জল তুলে ছিটিয়ে দেয় কঠিন পাথরের ওপর। 'তুমি ভুলে গেছ সে বলেছিল যতদূরেই থাক সে তোমাকে ছেড়ে যাবে না কোনদিন।...তোমার মেয়ে ভোলেনি সে কথা। সে বয়ে গিয়েছে অনেক দূর কিন্তু তোমার বুকের মধ্যে কুলকুল করে সে এখনও কথা কয় যেমন সে বলত তার প্রথম চোখ মেলার দিনে।'

কেউ কোন কথা বলে না। হুংকার দিয়ে তেড়ে আসে না কোন দৈত্য। মনে হয় পাহাড় যেন কান পেতে শুনছে পুটোর কথা আর ঝরণার ঝিরঝির কেমন করে বাজে তার বুকের ভেতর।

হঠ্যাৎ পাহাড় কেঁপে ওঠে। উঁচু চূড়োটা যেন ঝুঁকে পড়তে চায় নদীর জলের ওপর। তারপর চাঁই চাঁই কালো পাথরের ফাঁক দিয়ে দুটি ছোট শাদা নুড়ি অনেক উঁচু থেকে গড়াতে গড়াতে এসে থামে পুটোর পায়ের কাছে।

পুটো তুলে নেয় সেই শাদা পাথর। এমনি দুটো চকমকি পাথরের খোঁজ করেছে সে কতদিন থেকে।

পুটো দেখে দূর থেকে তাদের বাড়ি যেন অন্ধকারে মিশে রয়েছে।

হয়ত সে ফিরে আসেনি বলে কেউ আলো জ্বালেনি ঘরে। সবাই হয়ত ভাবনা করছে সে হারিয়ে গিয়েছে বলে। পুটো এখন ছোটে বাড়ির দিকে। সে আর অন্ধকারকে ভয় পায় না। সে ছুটতে ছুটতে তার হাতের পাথর ঠোকে। আলোর ফুলকি দেখে পথ চিনে নিতে পারে পুটো সহজে। নদী যেন তাকে গান শোনায়, বুক চিতিয়ে দিয়ে পাহাড় বলে, 'ভয় নেই।'

ওই তাদের বাড়ি। কাছে আসতে পুটো চিনতে পারে অন্ধকারে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে পাশাপাশি হিনিদিদি, দখিদাদা আর নবীন পটুয়া। আর একপাশে তিনকড়ি।

ওরা তাকে দেখতে পেয়ে হাত তুলে ডাকে, 'পুটো, পুটো'। তিনকড়ি সমানে ভৌ ভৌ করে। পুটো সাড়া দিয়ে বলে, 'আমি পেয়েছি, পেয়েছি সেই মেয়ের খোঁজ। দৈত্য বলে কিছু নেই, ওই পাহাড়টাই সত্যি। আর সত্যি ওই নদী যা নেমে এসেছে পাহাড়ের কোল বেয়ে।'

দখিদাদা চোখ বড় বড় করে তাকায় পুটোর মুখের দিকে। দৈত্য বলে যে কেউ নেই তা তো গোটা চূড়ামণের লোকই পাহাড়ে উঠে দেখে এসেছে আজ। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কতজনাই তো চড়াও হয়েছিল পাহাড়ের ওপর।···কিন্তু পুটো তা জানল কেমন করে? অবাক হয়ে বুড়ো মানুষটা দেখে তার খোকাবাবাকে। এই কি সেই পুটো যাকে সেদিনও কোলে করে মেলায় নিয়ে যেত দখিদাদা। সে আজ কোন সাহসে অতদূরে গেল আবার ফিরে এল যেন সাতরাজ্যি জয় করার আনন্দ নিয়ে।

পুটো তার হাতের চকমকি পাথর দেখিয়ে বলে, 'এই দেখো, পাহাড় আমায় কি দিয়েছে। এখন আর অন্ধকারকে ভয় করব না আমি। যখনই দরকার হবে পাথর ঠুকব—জ্বলে উঠবে আলোর ফুলকি।' সত্যি সত্যি চকমকি পাথর দুটো ঠুকে সে কথা শেষ করে।

সেই আলোয় দেখা যায় দখিদাদার কোটরে বসা চোখ দুটোয় জল চিকচিক করছে। পুটোকে দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে ভাঙা ভাঙা গলায় বুড়ো বলে, 'এতদিন আমি যা বলে এসেছি, জেনে এসেছি তা মিথ্যে হয়ে যাক খোকাবাবা। আজ থেকে চিরকালের জন্য তোর জানাটাই সত্যি হয়ে থাকুক। তোর হারিয়ে যাওয়াটা মিথ্যে হোক, সত্যি হয়ে থাকুক আমার বুক জুড়িয়ে দিয়ে এমন করে ফিরে আসা'।

* * *

পরদিন সকাল হতে আকাশের অন্ধকার কাটে, সকলে দেখে কালো পাথরে গড়া পাহাড়টা যেন কোন মন্তরে আলোয় আলো হয়ে গিয়েছে। আর ওটাকে দেখে চূড়ামণের কারুর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। রোজই তো সকালে সূর্যের কিরণ পাহাড়ের গায়ে এসে লাগে কিন্তু কালো পাথরের চাঁইগুলোকে এত উজ্জ্বল দেখায়নি কোনদিন এর আগে। নদীকেও রূপোর হার পরা নাচুনী মেয়ের মত খুশিতে মাতাল হয়ে এভাবে ছুটতে দেখেনি কেউ। আজ সকালে সব ভালো—আকাশ, মাটি, জল। আর সবচেয়ে ভালো মানুষে মানুষে ভালবাসা।